সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • এপ্রিল-জুন ২০২৪

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

বাঙালি মুসলমানের জাগরণে

মীর মশাররফ হোসেন

৫-৯ মে ২০২৪এ South Asian Micro-Entrepreneurs Network কর্তৃক দুবাইয়ে আয়োজিত South Asia's Financial Inclusion Training (S-FIT) শীর্ষক প্রশিক্ষণে সিদীপ-এর একটি টিম অংশগ্রহণ করে। সেখানে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ডাটা ড্রিভেন ডিসিশান মেকিং, ডিজিটাল মাইক্রোফাইন্যান্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের The Role of Policy & Regulation in Sustainable Growth শীর্ষক সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন MRAএর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ্ (ছবিতে সর্বডানে)। তাঁর পাশে প্যানেলিস্ট হিসেবে কথা বলছেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা।

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

শিক্ষালোক

এপ্রিল - জুন ২০২৪ ● ১১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচি

বাঙালি মুসলমানের জাগরণে মীর মশাররফ হোসেন - স্কোয়াড্রন লিডার আহ্সান (অব.) ২
আন্তবিষয়ী বাস্তবতা - শহিদুল ইসলাম ৭
বিটঘর উন্মুক্ত পাঠাগারের কথা - রুনা আকতার ৮
গণিতভীতি দূর করতে করণীয় - অলোক আচার্য ৯
টরোন্টোতে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ - তুষার গায়েন ১০
কফি আবিষ্কার এবং পরের গল্প - এস এম মুকুল ১১
কবিতা - অসীম সরকার ১৪
রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণি - মো. মাহবুব হোসেন ১৫
ব্রোকলি চাষ - মো. ফায়সাল হোসেন ও প্রতাপ চন্দ্র রায় ১৭
আমাদের দেশে ব্রোকলি চাষ শুরুর কথা - ফজলুল বারি ২০
সফল নারী উদ্যোক্তা শামস-উন নাহার - মনজুর শামস ২২
সাফল্যের উদাহরণ রেহেনা বেগম - কিশোর কুমার ২৩
কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা - সরদার আরিফ উদ্দিন ২৬
বই আলোচনা: দাবাড়ু - নাজনীন সাথী ২৮

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

সম্পাদকীয়

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) বাংলাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্রষ্টাদের একজন। বিশেষত পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানের জাগরণে, তাদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিতে ও এগিয়ে যাবার প্রেরণা জোগাতে তাঁর অবদান বিরাট। কিন্তু বর্তমান জমানায় মশাররফ পাঠ আশঙ্কাজনকভাবে কম। এমনকি তাঁর অমর সৃষ্টি 'বিষাদ সিন্ধু'র স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতাও যেন এখনকার পাঠকদের কমে যাচ্ছে। এবারকার শিক্ষালোকে তাই মীর মশাররফ হোসেনকে খানিকটা তুলে ধরার এই প্রয়াস।

আন্তবিষয়ী বাস্তবতা বা intersubjective reality নিয়ে অধ্যাপক শহিদুল ইসলামের ছোট্ট লেখাটি ব্যতিক্রমী চিন্তার উদ্রেক করবে।

আমাদের শিক্ষার্থীদের মনে গণিত ভীতি শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা, কেননা এর সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানশিক্ষা ও যুক্তিশীলতা। এ ভীতি দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বইপড়াকে উৎসাহিত করতে ও সারাদেশে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টায় পাঠাগার কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে শিক্ষালোক ও আমাদের সংস্থা নিজস্ব মুক্তপাঠাগারের মাধ্যমে একটা ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। এ সংখ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি স্থানীয় পাঠাগার নিয়ে ছোট্ট আলোচনাটি এই ধারাবাহিকতার অংশ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিফলন নিয়ে লেখাটিতে রবীন্দ্রসৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

ব্রোকলির ওপর দুটি লেখা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় ও অজানা তথ্য জানা যাবে।

এছাড়া গ্রামীণ নারীদের উদ্যোগী কর্মকাণ্ড, মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের কার্যক্রম, বই-আলোচনা ইত্যাদি নিয়ে লেখাসমূহ পাঠক-পাঠিকার মনোযোগ আকর্ষণ করবে, আমার বিশ্বাস।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস
বাড়ী নং- ২২/৯, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

বাঙালি মুসলমানের জাগরণে
মীর মশাররফ হোসেন

স্কোয়াড্রন লিডার আহ্‌সান (অব.)

তার সমাজ ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজ। সমাজের অসঙ্গতি ও সমস্যা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রুপ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। তিনি অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। উদার মন নিয়ে 'গোকুল নির্মূল আশংকা' প্রবন্ধ লিখে তিনি স্বগোত্রীয়দের (বনেদি মুসলমান) হাতে নিগৃহীত হন

১. ১৮৪৭ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত সময়কালে তাঁর আবির্ভাব। জমিদার ঘরে জন্ম নিয়ে এবং বঙ্কিম যুগের লেখক হয়েও চিত্র এঁকেছেন জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ বাঙালি সমাজের। অত্যন্ত শক্ত করে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন বাঙালির মানস ও বাংলা সমাজ সম্বন্ধে। নিজে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না থেকেও, লেখনীর মাধ্যমে তীব্র, কটু ও কড়া কথা শুনিয়ে সমাজকে শোধরানোর চেষ্টা করেছেন; রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের জন্য জাগরণের প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর প্রজ্জ্বলিত আলোর শিখা অনুসরণ করে আমরা বাঙালিরা আজ এতদূর এসেছি। আমাদের যেতে হবে সামনে আরও দূরে। সময় আমাদের এ দায়িত্ব বহনের সুযোগ এনে দিয়েছে। ১৯৪৭ সালে তাঁর জন্মের শততম বছরে আমরা একবার স্বাধীনতা পেলেও আসলে তা ছিল ধোঁকা; কেবল দূর পশ্চিমের হাত থেকে নিকট পশ্চিমের কাছে হাত বদল। ১৯৭১ সনে আবার আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। এরই মধ্যে ইতিহাসের অংকে এক অধ্যায় পারও হয়েছে। আমরাও এগিয়েছি সত্য, কিন্তু কতটুকু এগিয়েছি, তা বুঝব কোন মানদণ্ডে? এক্ষেত্রে তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।

২. বাঙালি মুসলমানদের অবস্থা

ক. ব্রিটিশ দখল: পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রি.) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে যাওয়ার পর (১৭৬৫ খ্রি.) থেকে 'সুবে বাংলা'য় 'ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব' শুরু হয়। তারা পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নানাভাবে চালায় সামরিক ও সাস্কৃতিক অভিযান। প্রথমত এদেশবাসীকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে, দ্বিতীয়ত ইংরেজি ভাষা শেখায়, তৃতীয়ত ব্রিটিশ মিশনারিদের সাহায্যে লোকজনকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রয়াস চালায়। নিজেরাও বাংলা শেখে। এভাবেই বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করে।

খ. মুসলমানদের দুর্গতি: মুসলমান শাসকদের হাত থেকে রাজশক্তি ছিনিয়ে নেয়ার পর ব্রিটিশদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক হয় দ্বন্দ্ব-সংশয়ের। ব্রিটিশরা অপকৌশল প্রয়োগ করে মুসলমান সম্প্রদায়কে আর্থিক দারিদ্র্য ও দুর্গতিতে নিক্ষেপ করে। পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভিন্ন

সুযোগ-সুবিধা দিয়ে হাত করে। তারা সংস্কারের (যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ও নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত) মাধ্যমে মুসলমান ভূস্বামীদের বানায় নিঃস্ব প্রজা। রাজভাষা হিসেবে ফারসির বদলে চালু করে ইংরেজি। ফলে চাকুরি-নির্ভর অগণিত মুসলমানের জীবিকার পথ হয় বন্ধ। বাঙালি হিন্দুরা করে তাদের সহযোগিতা আর বাঙালি মুসলমানরা দেখায় ঘৃণা ও অসহযোগিতা। এভাবেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বাংলাদেশে আঠারো শতক পার হয়।

গ. আত্মঘাতি আন্দোলন: উনিশ শতকের প্রথম থেকে পূর্ববঙ্গে হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার পুত্র মুহম্মদ মোহসীন ওরফে দুদুমিয়ার নেতৃত্বে এবং পশ্চিমবঙ্গে মীর নিসার আলীর (তিতুমীর) নেতৃত্বে ফারাজী আন্দোলন শুরু হয়। আরবে ওহাবী আন্দোলনের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি এটা ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের আর্থিক দাবী-দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম। পরে তা ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমেদ বেরলভির নেতৃত্বে বৃহত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি মুসলমানরা এই আন্দোলনে প্রচুর অর্থ সাহায্য দেয়। এ আন্দোলন ভারতের মুসলমানদেরকে ব্রিটিশ সাহচর্য বর্জন, ইংরেজি শিক্ষা বর্জন, নীলকরদের দাদন বন্ধ, নীলকর জমিদারদের কাজ ফেলে রেখে সরে পড়া প্রভৃতি কাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। তবে অন্ধ-আবেগপ্রবণ, প্রতিক্রিয়াশীল, রাজনৈতিক সংগঠনহীন এবং আত্মঘাতি এ আন্দোলন বাঙালি মুসলমানদের দৃষ্টিকে করে রেখেছিল অতীতমুখী। অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের মতে, "ওহাবী আন্দোলনে বাংলাদেশের বা বাঙালি মুসলমানদের সমাজ জীবনের কোন ছাপই পাওয়া যায় না।" তারই প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতামূলক আলীগড় আন্দোলন, যার নেতৃত্ব দেন স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ।

ঘ. সাংস্কৃতিক ঝাঁকুনি: রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে শোষিত হলেও ইংরেজি ভাষা শেখার ফলে বাঙালিরা সাংস্কৃতিকভাবে লাভবান হয়। ব্রিটিশদের চাপিয়ে দেয়া খ্রিস্টধর্মকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের স্থবিরতায় ঝাঁকুনি লাগে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় এবং বাংলার শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নবজাগরণ আসে। ডক্টর কিরণ চৌধুরীর মতে, "উপমহাদেশে বাঙালি জাতিই হল এই নতুন শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পদের প্রথম সংগ্রাহক।" সেই অর্থে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিই উপমহাদেশের নবজাগরণের অগ্রদূত।

ঙ. ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন: খ্রিস্টধর্মকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের স্থবিরতায় ঝাঁকুনি লাগার ফলেই বাঙালি হিন্দু মনীষীগণ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন (শ্রী চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম, রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দু ধর্ম প্রভৃতি) শুরু করেন, যা বাঙালি সভ্যতার বিকাশে প্রভূত অবদান রাখে। সে তুলনায় পশ্চাৎপদ ফারাজী ও ওহাবী আন্দোলন বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ততটা সাড়া জাগাতে পারেনি। ব্যতিক্রম শুধু যশোরের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭)। তিনি তাঁর বক্তৃতা, সাহিত্য ও সমাজসেবা দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের খানিকটা উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

চ. নবজাগরণের সূচনা: বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা করেন 'হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদী' রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের 'মূর্ত প্রতীক'। সভ্যতার মাপকাঠি হল সমন্বয়-সাধনের ক্ষমতা। ইতিহাসের স্রোতে যখন বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব একই সমতলে এসে সমবেত হয়, তখন স্বভাবতই শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের। এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলেই সভ্যতা অগ্রগতির পথে এগুতে থাকে। রামমোহন এই কাজটি করতে সক্ষম হন। তিনি হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি ধর্ম ও যুক্তিবাদের সমন্বয় সাধন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার সূচনা করেন। এভাবেই আবহমান বাঙালি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূচনা ঘটে।

ছ. বাঙালি সভ্যতা বনাম বাঙালি মুসলমান: বাংলাদেশের মানুষ ধর্মাশ্রয়ী। বাঙালি সভ্যতাও ধর্মাশ্রয়ী। তবে কোন একক ধর্মে নয়। সর্বপ্রাণবাদ, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান প্রভৃতি বহু ধর্মের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই সংকর জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত এবং বিশ্বমানবতার (সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই) জয়গান গাওয়াই এই সভ্যতার মূল কথা। উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগরণে ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীচৈতন্যবাদ ও যীশুবাদের সংমিশ্রণ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইউরোপের নবজাগরণ যেভাবে সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়, বাংলার নবজাগরণও তেমনি সকল ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। রাজা রামমোহন সূচিত জাগরণকে পরিণতি এনে দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ বাঙালি মনীষীগণ। এরা সবাই শিক্ষিত হিন্দু পরিবার থেকে আগত এবং ব্রিটিশদের সুবিধাভোগী হলেও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাদি বাঙালি সভ্যতা বিনির্মাণে কাজে লাগান। সে তুলনায়, বাঙালি মুসলমানরা ছিল ধর্মীয় দিক থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রাজনৈতিক দিক

থেকে নিগৃহীত, অর্থনৈতিক দিক থেকে পর্যুদস্ত এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

৩. মীর মশাররফ হোসেন

ক. আবির্ভাব: উনিশ শতকের আগ পর্যন্ত দোভাষী পুঁথি, কবিগান, বাউলগান ছাড়া বাঙালি মুসলমানের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা তখন বদলেছে, পশ্চিমা শিক্ষা চালু হয়েছে। সেই শিক্ষায় আলোকিত হয়ে বাঙালি হিন্দুরা উন্নত রস ও রুচিসম্মত সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে। অথচ বাঙালি মুসলমানরা তখনও দোভাষী পুঁথি নিয়ে ব্যস্ত। এমনি এক গভীর আঁধারে আলোর রেখা হয়ে ফুটেছিলেন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)। বাঘা যতীন, লালন সাঁই ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার লাহিনীপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয় ১৮৪৭ সনের ১৩ই নভেম্বর। বাবা জমিদার মীর মোয়াজ্জেম হোসেন, মা দৌলতুন্নেসা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। ছোটবেলা থেকেই সহজাতভাবে লেখালেখি শুরু করেন।

খ. বেড়ে ওঠা: কুমারখালির 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙ্গাল হরিনাথ ছিলেন মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যগুরু। হরিনাথের 'গ্রামবার্তা' এবং ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা দুটিতে লেখার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যকর্ম শুরু হয়। পেশাগতভাবে ছিলেন নবাব/জমিদারদের কাচারি ম্যানেজার। কর্মস্থল ছিল নানান জায়গায়; কলকাতা, বগুড়া, টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার, ফরিদপুরের পদমদী এবং নিজের জন্মস্থান কুষ্টিয়া। বিয়ে করেন দুবার। প্রথমবার ১৮৬৫ সালে। বিয়েতে শ্বশুর নাদির হোসেন তার সুন্দরী কন্যা লতিফুন্নেসাকে দেখিয়ে 'কুরূপা ও বুদ্ধিহীনা' আজিজুন্নেসাকে গছিয়ে দেন। বিয়েতে প্রতারিত হয়ে এবং স্ত্রীর সঙ্গে অমিলের কারণে বহুদিন উদাসীনভাবে "পঞ্চ 'ম'কারের" সাধনায় রত ছিলেন। পরে ১৮৭৪ সালে 'দরিদ্র কৃষকের' মেয়ে কুলসুম ওরফে কালীকে বিয়ে করে সংসারে মনোযোগী হন। চাকুরি ও সংসারের নিরীহ নিরিবিলি জীবন-যাপনের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি সাহিত্য রচনা করেন। 'গাজী মিয়ার বস্তানী' আর 'বিবি কুলসুম' বই দুটিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কাঙাল হরিনাথের পরে, দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমই ছিলেন তাঁর সাহিত্য রচনার অনুপ্রেরণাদাত্রী।

গ. অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিবৃত্তির জনক: সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর সময় বাংলায় সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা ছিল 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'বঙ্গভঙ্গ রদ' আন্দোলন। 'রদ' আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথসহ বাঙালি হিন্দুরা এবং বঙ্গভঙ্গের পক্ষে ছিলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীসহ সব বাঙালি মুসলমানরা। কিন্তু এদের সাথে তাঁর কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ওহাবী আন্দোলনের সময় তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। অথচ ওহাবী ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যে কোন কিছু পাওয়া যায় না। তবে সমাজসচেতনতা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তার সমাজ ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজ। সমাজের অসঙ্গতি ও সমস্যা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রুপ তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। তিনি অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। উদার মন নিয়ে 'গোকুল নির্মূল আশংকা' প্রবন্ধ লিখে তিনি স্বগোত্রীয়দের (বনেদি মুসলমান) হাতে নিগৃহীত হন। তাঁর সমকালীন গুণী ব্যক্তি নবাব আব্দুল লতিফকে তিনি তাঁর 'বসন্ত কুমারী' নাটক উৎসর্গ করেন কিন্তু কলকাতার 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'র সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য।

ঘ. বাংলা সাহিত্যে ইসলামী আদর্শের সংযোজক: ইসলামের মহত্ত্ব, গৌরব ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'এসলামের জয়' 'মৌলুদ শরীফ' 'মদিনার গৌরব' এবং 'মোসলেমের বীরত্ব' প্রভৃতি বইতে। 'এসলামের জয়' বইয়ের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর মহৎ বাণীর মাধ্যমে তিনি ইসলামের মহান আদর্শ প্রকাশ করেন। তার মর্মার্থ এই যে, ইসলামের অর্থই হচ্ছে শান্তি, সংযম ও শালীনতা; মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। হিংসা, দ্বেষ, মোহ, মাৎসর্যের দমন এবং মানবজীবনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলোকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে তাদের উপর নফ্স বা আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। বিপদে ধৈর্য, পরাজয়ে ভেঙ্গে না পড়া, জয়ে নম্রতা এবং হেলায় ত্যাগ করতে পারার শক্তিই ইসলামের আদর্শ শক্তি। তাঁর অনুভূতিতে ইসলামের আদর্শ ছিল কিন্তু তিনি প্রচারধর্মী ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। তার প্রমাণ 'জমিদার দর্পণ', 'গাজী মিয়ার বস্তানী' এবং 'বাজিমাৎ' প্রভৃতি।

ঙ. সমন্বয়ধর্মী সাহিত্য ধারার স্রষ্টা: বাঙালি মুসলমানদের রচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমন্বয়ধর্মী ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী দু'টি ধারা দেখা যায়। মীর মশাররফ হোসেন সমন্বয় ধারার উদ্বোধন করেছিলেন। তার সাথে বাঙালি সভ্যতার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এই ধারার উত্তরাধিকার বহন করেন কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলাম, কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, সৈয়দ ওয়াজেদ আলী, সৈয়দ মুজতবা আলী, হুমায়ূন কবীর প্রমুখ। তাদের অনুসারীরাই আজকের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রবাহমান সাহিত্য ধারার উত্তরসূরী। যার সঙ্গে ক্রমবিবর্তনের ধারায় মিশ্রিত হয়েছে

ইসলামী সাহিত্য, রবীন্দ্র যুগ, কলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রিক সাহিত্য। এই সবকিছুই বাঙালি সভ্যতার অমূল্য সম্পদ।

চ. বাঙালি মুসলমানের অনুপ্রেরণার উৎস: যে কথাটি না বললেই নয়, বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মীর মশাররফ হোসেনের যোগ্য উত্তরসূরি। কাজী নজরুল, হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনের নানান ঘটনা এবং ইসলামের ইতিহাসকে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যত জনপ্রিয় করেছেন, বাংলা সাহিত্যে এমন অনবদ্য সৃষ্টি আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবে, একথাও সত্য যে, বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জাগরণের লক্ষ্য নিয়ে তিনি যতটা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন ইসলামের নীতি ও আদর্শের প্রতিফলনে ততটা করেননি। এক কথায়, বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি এবং বাঙালি কৃষ্টি ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমানদের সচেতন ও অনুপ্রাণিত করার সূচনা করেছেন মীর মশাররফ হোসেন আর জাগরণের বাঁশী হাতে নিয়ে তাকে নিজ পায়ে দাঁড় করিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

৪. মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সম্ভার

ক. রচনা: মীর মশাররফ হোসেন একাধারে উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, আত্মজীবনী, রসরচনা, নাটক ও প্রহসন মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশটি বই লিখেন। রত্নাবতী (১৮৬৯) তাঁর প্রথম উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ রচনা হলো: গোরাই ব্রীজ বা গৌরি সেতু (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), এর উপায় কি (১৮৭৫), বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১), সংগীত লহরী (১৮৮৭), গো-জীবন (১৮৮৯), বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৯৮), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), তহমিনা (১৮৯৭), টালা অভিনয় (১৮৯৭), নিয়তি কি অবনতি (১৮৮৯), গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), মৌলুদ শরীফ (১৯০৩), মুসলমানদের বাঙ্গালা শিক্ষা (দুই ভাগ ১৯০৩, ১৯০৮), বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫), মদিনার গৌরব (১৯০৬), বাজীমাৎ (১৯০৮), আমার জীবনী (১৯০৮-১৯১০), আমার জীবনীর জীবনী বিবি কুলসুম (১৯১০) ইত্যাদি। এছাড়া তিনি কলকাতার 'প্রভাকর' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্তা' পত্রিকার মফস্বল সাংবাদিক এবং 'আজিজুন্নেহার' ও 'হিতকারী' নামক দুটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর জমিদার দর্পণ নাটকটি ১৮৭২-৭৩ সালে সিরাজগঞ্জের কৃষক-বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত। বাঙালি মুসলমানদের জাগাতে সাহায্য করেছে, তার এমন কিছু রচনা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল:

খ. বিষাদ সিন্ধু: প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রসঘন সংকর গদ্যকাব্য 'বিষাদ সিন্ধু'র কথা। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ও প্রাচীনতম উপন্যাসগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। হিজরি ৬১ সালে সংঘটিত কারবালার যুদ্ধ ও এর পূর্বাপর ঘটনাবলি এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। এটি কাব্যিক শৈলীতে রচিত। পুঁথি পড়তে অভ্যস্ত বাঙালিকে নতুন স্বাদ দিতে চেয়েছিলেন বোধ হয়। কারণ বাংলা সাহিত্যে তখনও উপন্যাস তেমন একটা রচিত হয়নি। তাই, মীর মশাররফ হোসেনসহ অন্যান্য লেখকগণ এসময় বাংলা উপন্যাসের ধারা সৃষ্টি করছিলেন। উপন্যাসটি যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ সালে তিন ভাগে প্রকাশিত হয়; পরবর্তীতে সেগুলো এক খণ্ডে মুদ্রিত হয় ১৮৯১ সালে।

বিষাদ সিন্ধু একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও ইতিহাসের দিক থেকে এতে উল্লিখিত সকল ঘটনা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে, এতে কারবালার বিষাদময় করুণ কাহিনীর মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের দুঃখ-কষ্টকে জাতীয় বেদনার আঙ্গিকে ব্যক্ত করেছেন। এই বেদনাকে গভীরতা দেবার এবং সুদূরপ্রসারী করে তোলার জন্যই তিনি বিষাদেরও 'এক সমগ্ররূপ ধ্যান' করেছেন। এ যেন ঘুমন্ত মানুষকে জাগাবার প্রয়াস। এজন্য 'বিষাদ সিন্ধু' আজও জনপ্রিয়। বাঙালি মুসলমানগণ এই বইকে ধর্মীয় জ্ঞানে শ্রদ্ধা করে থাকেন, বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

গ. জমিদার দর্পণ: তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমিদার দর্পণ। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণের' সঙ্গে মিল রেখে সেকালের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান কৃষক-প্রজাদের প্রতি জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়নের সমাজচিত্র এঁকেছেন নিপুণ হাতে। অর্থ-লোভ, ঘুষ ও জুয়ার প্রভাবের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ইন্সপেক্টর, উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, ডাক্তার এবং জিতু মোল্লা ও হরিদাস প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে। এ অবস্থা আজও বিদ্যমান। এসব অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনীর পাশাপাশি সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন সেকালের ভূমিপুত্রদের গণজাগরণজনিত ধূমায়িত চিত্ত ও বিক্ষোভের ইঙ্গিত।

ঘ. গাজী মিয়াঁর বস্তানী: তাঁর সমাজ-চিন্তার নিরঙ্কুশ স্পষ্টবাদী আত্মপ্রকাশ ঘটেছে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' শীর্ষক সংকর রচনায়। এতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে। তবে বঙ্কিম এঁকেছেন হিন্দু সমাজের চিত্র আর মীর মশাররফ এঁকেছেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালি সমাজের চিত্র। এই গ্রন্থে তিনি অতীতকালের সামাজিক জীবনের এক বৃহৎ স্থির-চিত্র এঁকেছেন। উল্লেখ্য যে, এই বইয়ের বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে তাঁর জীবনও বিপন্ন হবার উপক্রম হয়। তাঁকে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। এই বইয়ের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে

তিনি নিজেই বলেছেন, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানীর মধ্যে না আছে এমন কথা নাই, দুনিয়ার জাহানে..., সংসার ক্ষেত্রে যত প্রকার বৃক্ষলতা, গুল্ম গাছা, আগাছা-পরগাছা, বিশাল, রসাল, মিষ্ট কটু, কষায় টক, অম্ল মধুর, ছোট বড় সর্বাঙ্গ কণ্টক, সর্বাঙ্গ মধুমাখা, নয়নমনের তৃপ্তিকর, বিরক্তিকর যাহা যাহা আছে, গাজী মিয়াঁর বস্তানীতে তাহার অভাব নাই। একটু চিন্তা করিয়া নথি উল্টাইলেই বুঝিতে পারিবেন।'

ঙ. এসলামের জয়: তাঁর আবেগময়-সন্দর্ভ 'এসলামের জয়' গ্রন্থে পরাধীনতার গ্লানি ও স্বাধীনতার আনন্দ এবং জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উক্তি রয়েছে। তার মধ্যে একটি এখানে উল্লেখ করা হল: 'স্বরাজ্যে স্বরাজ অপেক্ষা গৌরবের কথা অস্থায়ী জগতে আর আছে কি ভাই? স্বরাজই যদি পররাজ হইল, তবে গোলামী করিয়া জীবন-ধারণ করা অপেক্ষা জীবনপাত করাই শ্রেয়। ... জননী জন্মভূমির মায়া যে নরাধম পামরের হৃদয়ে নাই, তাহার জীবন বৃথা। নিজ জীবন রক্ষা করতে স্বদেশের স্বাধীনতা যাহারা পরহস্তে তুলিয়া দেয়, তাহাদের ন্যায় কুলাঙ্গার দেশবৈরী আর কে আছে?'

তার কাব্যগ্রন্থ 'গৌরি সেতু'র সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' মীর মশাররফের রচনারীতি সম্বন্ধে লেখেন: "তাহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙলা অনেক হিন্দু লিখতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়।"

৫. শেষ কথা

মীর মশাররফ হোসেনের হাত দিয়েই বাঙালি মুসলমানের আত্মমুখী শক্তি বিকাশের যাত্রা শুরু। তিনিই মূলত বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির পথ প্রদর্শক এবং পরবর্তী যুগের বাঙালি মুসলমান লেখক-সাহিত্যিকদের অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস। তাঁর সাহিত্যকর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বাংলা সাহিত্যে আসেন শেখ আব্দুল লতিফ, নওয়াব ফয়েজুন্নেসা, মোজাম্মেল হক, মুন্সি রেয়াজুদ্দিন আহমেদ, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দিন আহমদ মাশহাদীসহ আরও অনেকে। তাদের পথ অনুসরণ করেই আসেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ক্রমান্বয়ে তার পরের প্রজন্ম। অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাইয়ের মতে, ইংরেজ ও ইংরেজী ভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানরা যখন শতবর্ষের বিরূপ মনোভাব আর তাদের সাথে নানান সংঘর্ষে বিপর্যস্ত তখন ইংরেজী শিক্ষক ও ইংরেজদের আশীর্বাদপুষ্ট কয়েকজন সৃষ্টিশীল বাঙালি হিন্দুর প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে সংকর ও মহত্তর বাংলা সাহিত্য। একমাত্র মীর মশাররফ হোসেন এবং পরে কবি নজরুল ইসলাম এই মহত্তম সাহিত্যের অংশীদার। এজন্য মীর মশাররফকে বলা হয়, 'বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যিক চূড়ামণি' এবং 'এ যুগের বাঙালি ও বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের পিতামহ বা দাদা'। এক কথায়, তার সাহিত্যকর্ম পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমানদের বাঙালির নবজাগরণের সাথে সম্পৃক্তি ঘটায়, যা কালক্রমে বাঙালি জাতিকে, বাংলাদেশকে এবং বাঙালি সভ্যতাকে আজকের পর্যায়ে উত্তরণ ঘটাতে সাহায্য করে। কিন্তু সমাজের কতটুকু উত্তরণ ঘটেছে, তা তাঁর রচনার গভীরে প্রবেশ করলেই পার্থক্য বুঝা যায়!

তাঁর শেষ জীবন কাটে তাঁরই চাচাতো ভাই ও পৃষ্ঠপোষক ফরিদপুরের জমিদার ও রাজনীতিবিদ নওয়াব মীর মোহাম্মদ আলীর পদম্দী এস্টেটের ম্যনেজার হিসাবে। ১৯১২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। সাবেক ফরিদপুর এবং বর্তমান রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার পদম্দীতে তিনি সমাধিত হন।

১। ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাসকথা, ৩য় খণ্ড; আধুনিক যুগ, ৬ষ্ঠ সংস্কার, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি., কলকাতা, ১৯৭০, পৃ.২৪৪-২৪৫।

২। মহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) ২য সংস্করণ, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৪, পৃ. ৩-১৯।

৩। আবুল আহসান চৌধুরি, মীর মশাররফ হোসেন, জীবনী গ্রন্থমালা সিরিজ, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩, পৃ. ১১।

৪। অধ্যাপক শাহ হালিম উয্যামান এবং অন্যান্য, নোটস অন মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, ৪র্থ সংস্করণ, এম. আব্দুল্লা এন্ড সন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, জানুয়ারি ২০০০ খ্রি., পৃ.১৭।

৫। সেলিনা হোসেন এবং নূরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমী চরিত্রাভিধান, ২য় সংস্করণ, জুন ১৯৯৭, পৃ. ২৮৬।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, 'মীর মশাররফ হোসেন' 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা' ৫ম সংস্করণ, ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১।

৭। মুনীর চৌধুরি, 'মীর-মানস', ২য় মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৮।

৮। আব্দুল আউয়াল, 'মীর মশাররফ হোসেন' কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭১

৯. http://www.banglapedia.org/httpdocs/HTB/104210.htm

১০. http://www.banglapedia.org/httpdocs/HTB/100867.htm

১১. http://www.banglapedia.org/httpdocs/HTB/101445.htm

১২. http://www.banglapedia.org/httpdocs/HTB/105122.htm

লেখক: সমালোচক ও অনুবাদক। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ "লাস্কির 'রাজনীতির ব্যাকরণ' ও বাংলাদেশের রাজনীতি" (সৌম্য প্রকাশনী)

আন্তবিষয়ী বাস্তবতা

শহিদুল ইসলাম

স্বাধীনতার পর যখন পাকিস্তানি টাকা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন আমার ও আরো অনেকের বহু টাকা সাদা কাগজে পরিণত হয়। আজ যে ক্রেডিট কার্ডে সবাই বাজার করে, সমস্ত সুপারমার্কেট যদি সেগুলি গ্রহণে অস্বীকার করে তাহলে ক্রেডিটকার্ডের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তা মূল্যহীন

'হীরক রাজার দেশের' জ্ঞানের কোন শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই– শাসক শ্রেণীর মনের কথা। কিন্তু জ্ঞানের অনুসন্ধান যে কত আনন্দের তা ৮০ বছরে পা রেখে নতুন করে বুঝলাম। আমরা সবাই এতদিন দুই ধরনের বাস্তবতার (reality) কথা জেনে এসেছি– objective reality and subjective reality। আইনস্টাইন যখন সময়কে বস্তুর চতুর্থ ডাইমেনশন হিসেবে প্রমাণ করলেন, তখন আমরা অবাক ও নতুন একটি জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। Objective ও Subjective reality ছাড়াও যে আরও একটি realityর অস্তিত্ব আছে, সে সম্বন্ধে তেমন কোন বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান আমাদের ছিল না। Yuval Noah Harari তাঁর *Homo Deus* বইতে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে তৃতীয় একটি realityর কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেসব কথা উদাহরণ সহযোগে বলেছেন, তা নতুন নয়। আমরা সবাই জানি। কিন্তু তিনি সেই তৃতীয় realityকে একটি শব্দের মাঝে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা নতুন। তাই এই ৮০ বছর বয়সে সেটা পড়ে যুবকের মত আত্মহারা হয়ে গেছি। এখানেই সরাসরি বই পড়ার অগ্রাধিকার কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। নতুন বই-এর নতুন চিন্তা বয়সকে ছাপিয়ে যায়।

আমরা জানি, হারারির ভাষায়, 'In objective reality, things exist independently of our beliefs and feelings .... Subjective reality, in contrast, depends on my personal beliefs and feelings.' তিনি তৃতীয় যে realityর কথা বলছেন তার নাম, 'Intersubjective reality'– যা আছে বলে আমরা শক্তভাবে বিশ্বাস করি, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তার কোন অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, এরকম কিছু বস্তুহীন বাস্তবতার নাম দিয়েছেন 'intersubjective reality'– যেমন 'অর্থ'। অর্থের কোন objective মূল্য নাই। কিন্তু কোটি কোটি মানুষ যখন বিশ্বাস করে, তখন সেই অর্থ দিয়ে তুমি খাদ্য, মদ, কাপড়, গহনা কিনতে পার। কিন্তু রাষ্ট্র যদি সেগুলি বাতিল ঘোষণা করে, তখন কেউ তা দিয়ে তোমাকে একটা সিঙ্গাড়াও দেবে না। এই আরোপিত মূল্যকে তিনি intersubjective reality বলছেন। স্বাধীনতার পর যখন পাকিস্তানি টাকা নিষিদ্ধ করা হয়, তখন আমার ও আরো অনেকের বহু টাকা সাদা কাগজে পরিণত হয়। আজ যে ক্রেডিট কার্ডে সবাই বাজার করে, সমস্ত সুপারমার্কেট যদি সেগুলি গ্রহণে অস্বীকার করে তাহলে ক্রেডিটকার্ডের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তা মূল্যহীন।

তেমনি এক সময়ে বাতাসে ইথারে বিশ্বাস ছিল সর্বজনীন। কিন্তু ১৭৭২ সালে অক্সিজেন আবিষ্কারের পর ইথারের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। তেমনি নিউটনের আগেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপস্থিতি থাকলেও তা আবিষ্কারের জন্য নিউটনকে সম্মান দেয়া হয়। তেমনি আত্মা। বহু মানুষ, এমনকি ডাক্তাররা পর্যন্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। কিন্তু বিজ্ঞান আজ আত্মার ধারণা সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছে। তেমনি উনিশ শতকের গণতন্ত্র আজ অচল মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। এমনি অনেক উদাহরণের সঙ্গে তিনি যুক্তিযুক্তভাবে intersubjective reality-র অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। যখন মানুষ বিশ্বাস করতো যে সূর্যই পৃথিবীর চারধারে ঘোরে, তখন সেটাই ছিল সেই সময়ের intersubjective reality।

হারারি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে সবসময় objective ও subjective realityর সঙ্গে intersubjective reality সহঅবস্থান করে। আজকের জন্যও তা সত্য। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এমন কিছুতে বিশ্বাস করে, যার কোন বাস্তব উপস্থিতি তারা প্রমাণ করতে পারবেন না। এটাই objective ও subjective realityর মধ্যবর্তী স্তর।

লেখক: শিক্ষাবিদ

বিটঘর উন্মুক্ত পাঠাগারের কথা

রুনা আকতার

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের মধ্যে থাকে অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল এবং জানার অসীম আগ্রহ। মানুষের এই সকল প্রশ্নের সমাধান আর অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। গ্রন্থ বা পাঠাগার মানুষের মনের খোরাক জোগায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানব আত্মার অমর আলোক প্রবাহ কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।"

মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার তেমনি মনের খাদ্যও তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে পাঠাগার। একটি সমাজকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই অর্থাৎ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক।

আমার এলাকায় একটি স্থানীয় পাঠাগারের পরিচিতি: আমার গ্রামের নাম বিটঘর। এই গ্রামে প্রায় ২০০০এর উপরে লোকের বসবাস। এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। গ্রামে কোন পাঠাগার ছিল না, ফলে গ্রামের লোকজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য বইয়ের জ্ঞান নিতে পারছিল না। ২০০৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি গ্রামের জনগণ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের পরামর্শের মাধ্যমে একটি ক্লাব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের গ্রামের সেই ক্লাবের ব্যক্তিবর্গ ও কিছু সাধারণ মানুষের নিজস্ব উদ্যোগে বিটঘর গ্রামে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮এ একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। বিটঘর ক্লাবের কিছু সদস্য ও সাধারণ জনগণের আপ্রাণ চেষ্টায় পাঠাগারটি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি কলেজের পাশেই পাঠাগারটি অবস্থিত। স্থানীয় লোকজনের প্রচেষ্টায় পাঠাগারটি প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিছু ধনী ব্যক্তির সহযোগিতায় গ্রামের পাঠাগারটি এখন অনেক উন্নত। নাম রাখা হয়েছে– বিটঘর উন্মুক্ত পাঠাগার।

স্থানীয় মানুষের দান করা জমিতে এই পাঠাগার নির্মিত হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক সব মিলিয়ে ১,০০০এর মতো বই রাখা হয়েছিল এখানে। বর্তমানে পাঠাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫,০০০। এতে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের এবং লেখকের বই রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুল নাচের ইতিকথা, হুমায়ুন আহমেদের জোছনা ও জননীর গল্প, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লোটা কম্বল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহীন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গল্প, উপন্যাস ও সায়েন্স ফিকশনসহ বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস সংক্রান্ত বই স্থানীয় পাঠাগারটিতে রয়েছে।

শুরুতে পাঠাগারটিতে প্রতিদিন ৩-৪ জন মানুষ জ্ঞান আহরণ করতে আসত। সেই হিসাবে ৩০ দিনে মোট পাঠকের সংখ্যা হত ৯০-১০০ জনের মতো। বর্তমানে পাঠাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সাধারণ মানুষ বইপ্রেমী হওয়ার কারণে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে পাঠাগারটিতে আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা প্রতিদিনের হিসেবে ১০-২০ জন। পাঠাগারটি সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে যার যখন ইচ্ছা সে তখন এখানে বসে বই পড়তে পারে। গ্রামের চাকরিজীবী ও ব্যাবসায়ীরা রাতে বসে পাঠাগারে পড়তে পারে। বই বাড়িতে নিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার পাঠাগারে ফেরত দিতে হয়। পাঠাগারটিতে ৪ জন ব্যক্তি কর্মরত আছেন।

পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক মোহাম্মদ কামাল চৌধুরী। পাঠাগার বা গ্রন্থাগার সম্পর্কে তিনি বলেন, একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার সব ধরনের পাঠকের জ্ঞান তৃষ্ণা নিবারণ করে, মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে অবদান রাখে। তাই পাঠাগারের মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নত, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হিসেবে গড়ে ওঠে। তিনি আরও বলেন যে, স্থানীয় পাঠাগারটি ভবিষ্যতে আরো উন্নত হবে এবং এই পাঠাগারকে ভিত্তি করেই আমাদের সমাজ ও সমাজের মানুষ সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

পাঠাগারটি নিয়ে একজন পাঠক বলেন, গ্রামে একটি লাইব্রেরি সক্রিয় থাকা মানে বিরাট ব্যাপার। পাঠাগারে অসংখ্য বইয়ের বাগানে বসে বই পড়ার মধ্যে আলাদা আনন্দ আছে।

পাঠাগার মানব হৃদয়ের মিলনক্ষেত্র। সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে পাঠাগার একান্ত অপরিহার্য। একটি সমাজের সকল মানুষকে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পাঠাগারের ভূমিকা অনেক। জাতির প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজের মত দেশের সবগুলো গ্রামের সব জায়গায় পাঠাগার স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি।

লেখক: সিদীপের শিক্ষা সুপারভাইজার, বিটঘর শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গণিতভীতি দূর করতে করণীয়

অলোক আচার্য

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীরা এখন ছুটছে কলেজে ভর্তির পেছনে। করোনা পরিস্থিতির পর এবারই প্রথম পূর্ণ সিলেবাসে এবং পূর্ণ নম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসসি, দাখিল ও সমমানের পরীক্ষা। এবার পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লেও কমেছে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা। আবার একজনও পাস করেনি এমন এবং শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারও ফলাফলে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরাই ভালো ফল করেছে।

এত তথ্যের ভিড়ে একটি বিষয় এবারও বের হয়ে এসেছে যে শিক্ষার্থীদের গণিত ভীতি কাটেনি। অর্থাৎ এতকিছুর পরেও শিক্ষার্থীদের কাছে গণিত আগের মতোই কঠিন বিষয়। যদিও গণিত শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ করে তোলার জন্য বহু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপকরণের যথেষ্ট ব্যবহার, গণিত অলিম্পিয়াড ইত্যাদি এসবের মধ্যে অন্যতম। এতে যে একেবারেই কিছু হয়নি তা নয়। তবে যারা গণিতে ভয় পায় তারা কিন্তু সেখান থেকে খুব একটা বের হতে পারেনি। ফল বিশ্লেষণে গণমাধ্যমের তথ্যে জানা যায়, ৯টি সাধারণ ও মাদরাসা বোর্ডে বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তি (আইসিটি), হিসাববিজ্ঞান, অর্থনীতিতে গড় পাসের হার ৯৬ শতাংশের ওপরে। বিপরীতে গণিতে পাসের হার ৯১ দশমিক ১৯ শতাংশ। অর্থাৎ, ৮ দশমিক ৮১ শতাংশ শিক্ষার্থী শুধু গণিতে ফেল করেছে।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা বলছেন, গণিতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক পর্যায় থেকে গণিতের দুর্বলতা শিক্ষার্থীদের খারাপ ফলাফলের পেছনে মুখ্য কারণ। বোর্ডভিত্তিক ফলাফলে গণিতে এ বছর সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে মাদরাসা বোর্ড। বোর্ডটিতে ১২ দশমিক ৬৪ শতাংশ শিক্ষার্থীই গণিতে ফেল করেছে। এরপর রয়েছে ঢাকা বোর্ড। এ বোর্ডে গণিতে ফেলের হার ১২ দশমিক ২৮ শতাংশ। কুমিল্লা বোর্ডে ১২ দশমিক ০৪ শতাংশ, দিনাজপুরে ১১ দশমিক ৯০ শতাংশ, ময়মনসিংহে ১০ দশমিক ৪৯ শতাংশ, রাজশাহীতে ৬ দশমিক ২৬ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৭ দশমিক ৬৩, বরিশালে ৭ দশমিক শূন্য ৪০ শতাংশ, সিলেটে ৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ শিক্ষার্থী গণিতে ফেল করেছে। তবে যশোর বোর্ড ব্যতিক্রম। বোর্ডটিতে গণিতে পাসের হার ৯৮ শতাংশ।

শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি এবং গণিত বিষয় দু'টিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। বছরব্যাপি প্রাইভেট পড়ান, কোচিং করান। এমন শিক্ষার্থী খুব কম পাওয়া যাবে যে গণিত বিষয়ে অন্তত কয়েক মাস প্রাইভেট পড়েনি বা কোচিং করেনি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এত গুরুত্ব দেওয়ার পরেও কিন্তু একটা বড় অংশের কাছেই গণিত ভীতি কাটছে না। যেসব বছর পাবলিক পরীক্ষার ফল তুলনামূলকভাবে খারাপ হয় সেক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইংরেজি এবং গণিত বা কোনো একটা বিষয়ে ব্যর্থতা রয়েছে। সম্ভবত প্রচলিত ধারণাতেই ছাত্রছাত্রীরা এটিকে ভীতির চোখে দেখে। এই ভীতির শুরু হয় শিশুকাল থেকেই। গণিত কঠিন এই ধারণাটি শিশুর পরিবার থেকেই দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জনের কোন বিকল্প নেই। বছর বছর পাবলিক পরীক্ষাতেও গণিত বিষয়ের ফল আশানুরূপ নয়।

গ্রাম ও শহরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণিত বিষয়ের দক্ষতায় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যের বিষয় চোখে পড়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়। বছর বছর প্রাইভেট পড়ার পরেও কেন গণিতে ফল খারাপ হয় তা নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। এর একটি কারণ হলো প্রাইভেট পড়ার বিষয়টা কেবল সিলেবাস শেষ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রকৃতপক্ষে তারা গণিত শেখার ধারে কাছেও যায় না। পাশ করার জন্য যতটুকু শেখার দরকার ততটুকু শিখেই শেখার কাজ শেষ করে ছাত্রছাত্রী। মূলত টার্গেটটা থাকে পরীক্ষায় ভালো ফল করা, গণিত শেখা নয়। এর বাইরে বেশিরভাগেরই আগ্রহ থাকে না। মাধ্যমিক পর্যায়ে শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে কম শিক্ষকই রয়েছেন যারা গণিত বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ বা শিক্ষার্থীদের কাছে তা সহজ করে তুলতে পারেন। একথা ঠিক যে এই শিক্ষকরাই শ্রেণিকক্ষে গণিত বিষয়ের পাঠদান করান। এবং তাদের যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। তিনি যেটা করেন তা হলো বিদ্যালয়ের সিলেবাস শেষ করেন।

শিক্ষক নিয়মিতভাবে তার ছাত্রছাত্রীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং উন্নয়নে পরামর্শ দেবেন। গণিতের প্রতি ছাত্রছাত্রীর ভীতি কাটতে থাকবে। পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও গণিত শেখার অন্যান্য মাধ্যম যেমন হাতে কলমে শেখার ব্যবস্থা করা দরকার। এছাড়াও বাড়িতে অভিভাবক সন্তানকে গণিত বিষয়ে চাপ না দিয়ে তাকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে গণিতে দক্ষ করে তুলতে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

লেখক: শিক্ষক ও কলামিস্ট , পাবনা

টরোন্টোতে বাংলা নববর্ষ ১৪৩১-এর বর্ণাঢ্য উদযাপন

তুষার গায়েন

মহা সমারোহে টরোন্টোতে নববর্ষ ১৪৩১ উদযাপিত হলো। কয়েকদিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও বিরামহীন বৃষ্টিপাত হঠাৎ করেই গতকাল সকালে উধাও– ছুটির দিন ঝকঝকে রোদ, স্বচ্ছ নীল আকাশ এবং মিঠেকড়া উষ্ণতার আমেজ নিয়ে উত্তর আমেরিকার অন্যতম প্রধান শহর টরোন্টোতে বাঙালিরা বহু বর্ণিল সাজে ও উচ্ছ্বাসে মিলিত হয়েছিল এখানকার বাঙালিপাড়া বলে পরিচিত মেট্রো-স্ট্যাপেলস-সপার্স ড্রাগমার্ট সন্নিহিত ড্যানফোর্থের উন্মুক্ত পরিসরে।

পুরুষদের পরিধানে ছিল প্রধানত পাজামা-পাঞ্জাবি; মেয়েরা সাদা লালপেড়ে শাড়ি, ফুলের গয়না এবং কপালে টিপ দিয়ে সেজেছিল অপরূপ। ঢাকার চারুকলার অনুসরণে মঙ্গল শোভাযাত্রার জন্য বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন, লোকায়ত মোটিফে করা বহুবর্ণিল মুখোশ, ঢোল-করতাল ও বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে একাত্ম হয়ে সবাই জড়ো হয়েছিল প্রাণ প্রাচুর্যে উপচে পড়া আনন্দ-প্রত্যয়ে। ওখান থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয় এবং প্রদক্ষিণ করে নিকটবর্তী এলাকা যেখানে বাঙালিদের অনেক দোকানপাট, বাণিজ্য বিতান, রেস্তোরাঁ এবং গ্রোসারির দোকানে বাঙালিদের যাওয়া-আসা, প্রাণের টানে মিলিত হওয়া, আড্ডা দেওয়া নিত্যদিনকার জীবন স্পন্দনকে ধারণ করে আছে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে টরোন্টোর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল, গায়ক, শিল্পী, লেখক, সংস্কৃতিকর্মী, বিভিন্ন পেশা ও বয়সের বাঙালিরা। কণ্ঠে দেশ, মানুষ ও নববর্ষ উদযাপনের সাথে সম্পৃক্ত গান, গানের তালে তালে নৃত্যছন্দে পায়ে পায়ে হেঁটে চলা এবং শুভ নববর্ষ বলে উচ্চকিত স্বরে ফেটে পড়ার আনন্দে সরব হয়ে ওঠে চারপাশ। পথচারীরা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, নিরাপত্তার রুটিন দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে মৃদু হাসি ও আনন্দ।

শোভাযাত্রা বৃত্তাকারে ঘুরে এসে পূর্ব পরিসরে দাঁড়ায়– এ ওর সাথে দেখা করে, কুশল বিনিময় করে এবং পরে সবাই আরো কিছুটা হেঁটে জড়ো হয় নিকটবর্তী ডেন্টোনিয়ার পার্কের সবুজ ঘাস আচ্ছাদিত মনোরম প্রান্তরে। সেখানে বাঙালির প্রাণের শহিদ মিনার এবং তার থেকে সামান্য দূরে নির্মিত হয়েছে সারাদিনব্যাপী বৈশাখী অনুষ্ঠানমালার জন্য সংস্কৃতিমঞ্চ। কিছু খাবারের স্টল ঝালমুড়ি, পিঠা, চা-সিঙাড়ার আয়োজনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। সেখানে অনেকের সাথে দেখা হয় যার মধ্যে বন্ধু ও কবি-ছড়াকার বাদল ঘোষ ও শিপ্রা বৌদি, সঙ্গীতশিল্পী মৈত্রেয়ী ও রতনদার সাথে সময় কাটে। মঞ্চে গান, নৃত্য ও কথামালার তরঙ্গে বাংলা ও বাঙালির প্রাণোচ্ছ্বাস সব অশুভ শক্তি, অন্ধকার এবং মৌলবাদী রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ছড়িয়ে পড়ে আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দ ও প্রতিজ্ঞায়। টরোন্টোর এবারের নববর্ষের সমাবেশ পূর্বের যেকোনো বছরের তুলনায় বড়, সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় ছিল।

বাংলা ও বাঙালি চির জাগ্রত থাক দেশ ও প্রবাসের প্রতিটি শহর, বন্দর ও অঞ্চলে। নববর্ষের আনন্দ ও প্রতিজ্ঞায় সমৃদ্ধ হোক সারা বর্ষব্যাপী বাঙালির ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবন। সকলের তরে অশেষ মঙ্গল কামনা!

এপ্রিল ১৫, ১৪৩১

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

কফি আবিষ্কার এবং পরের গল্প

এস এম মুকুল

কফি আপনাকে শুধু চাঙ্গাই করবে তা নয়, আপনার বুদ্ধিকেও কিছুটা শাণিত করতে পারে। কফির উপাদান ক্যাফেইন মনোদ্দীপক দ্রব্য। যা স্নায়বিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করতে পারে। নিয়মিত কফি পানে মানসিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কফির গন্ধই আপনাকে অনেকখানি চাঙ্গা করে দেয়। আর পেটে কফি পড়লে মনের বিষাদভাব কাটতে বেশি সময় লাগে না। কফি'র ভালো-মন্দ নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করছেন–

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিক্রিত পণ্য (জ্বালানি তেলের পরে) এবং বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বেশি পানকৃত পানীয়র মধ্যে অন্যতম কফি। এই কফি বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত, উত্তেজক পানীয় হিসেবে এর ব্যাপক পরিচিতি। কফির ইংরেজি নাম: Coffee। পানির সাথে ফুটিয়ে রান্না করা কফি চেরি নামক এক ধরনের ফলের বীজ যা কফি বীজ নামে পরিচিত তা পুড়িয়ে গুঁড়ো মিশিয়ে কফি তৈরি হয়। কফিতে ক্যাফেইন নামক এক প্রকার উত্তেজক পদার্থ রয়েছে। ৮ আউন্স কফিতে প্রায় ১৩৫ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে। কফির উপাদান ক্যাফেইনের জন্যে কফি মানুষের উপর উত্তেজক প্রভাব ফেলে ও উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। চায়ের পরই কফি বিশ্বের অত্যধিক জনপ্রিয় পানীয়।

আবিষ্কারের গল্প: আমরা জানব কফি কবে, কোথায়, কীভাবে আবিষ্কার হয়েছিল সে সম্পর্কে। কফি আবিষ্কার নিয়ে একটি মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। আরবে প্রচলিত আছে, বহু শতাব্দী আগে কালদি নামের এক মেষপালক একদিন দেখল তার মেষ ও ছাগলগুলো অদ্ভুত ধরনের আচরণ করছে। এ ঘটনা দেখে সে বোঝার চেষ্টা করল কেন তারা এমনটি করছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল মেষ ও ছাগলগুলো সবুজ এক প্রকার উদ্ভিদের লালচে ফল খাচ্ছে এবং চারদিকে লাফালাফি ছোটাছুটি করছে। মেষপালক দেখল, বড় মেষগুলোও ছোট শাবকদের মতো লাফালাফি ছোটাছুটি আর দুষ্টুমি করছে। এ ঘটনা দেখে মেষপালক নিজেই এ ফল খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। খাওয়ার পর নিজেকেও ওই মেষগুলোর মতো প্রাণবন্ত মনে হলো। পরে কালদি তার মালিকের কাছে এ অভিজ্ঞতার কথা জানাল। তার মালিকও সেই ফল খেয়ে একই রকম অনুভব করল। পরে জানা গেল, এ ফল ছিল আসলে কফি ফল। এই ঘটনার কোনো সত্য দলিল না থাকলেও বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়– ষোড়শ শতকে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কফি পানের প্রচলন শুরু হয়। এর পর কফি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

কফি বিষয়ক তথ্য: কফির আদি নিবাস ইথিওপিয়া। তবে আরবে ১৪ শতকের দিকে কফির চাষ করা হতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জেনে রাখুন, কফি দিবসও পালন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় কফি দিবস পালন করা হয়। ১৫ শতকের দিকে আরবরা সর্বপ্রথম কফি উৎপাদন করেন। ১৮৪৩ সালে এক ফ্রান্স নাগরিক সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে কফি তৈরির মেশিন আবিষ্কার করেন। জানা গেছে, বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে কফি ফলের গাছ জন্মে। সবুজ কফি বিশ্বের সব থেকে বেশি বিক্রিত কৃষিপণ্যের মধ্যে একটি। ১৯৯৯ সালের হিসেব অনুযায়ী আমেরিকার নাগরিকগণ প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিন কাপ কফি পান করে।

কফির দাওয়াই: নিয়মিত কফি পানকারীদের মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ২৩%-৬৭% কমার তথ্য পাওয়া গেছে। ১৫ বছরব্যাপী ৪১ হাজার নারীর অংশগ্রহণে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন তিন কাপ করে কফি পান হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সক্ষম। এ ক্যাফেইন রক্তের এলডিএল (ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল) কমাতে এবং এইচডিএল (উপকারী কোলেস্টেরল) বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রাখে। যারা এসবের ঝুঁকিতে আছেন, তাদের প্রতিদিন চার কাপ কালো কফি পান খুবই উপকারী হবে। কফি নিয়মিতভাবে খাদ্যের বিপাকীয় ক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে এবং যাদের হজমজনিত সমস্যা আছে, তাদের জন্য কফি উপকারী। চমকিত খবরটি হলো কফি পানে সামগ্রিক মৃত্যুঝুঁকি কমপক্ষে ৫ শতাংশ কমতে পারে। যারা দিনে ২-৩ কাপ কফি পান করেন তাদের ১০ শতাংশ এবং যারা ৪-৫ কাপ কফি পান করেন তাদের ১৪ শতাংশ মৃত্যুঝুঁকি কমে।

আত্মহত্যার প্রবণতা কমায় কফি! কমপক্ষে দুই লাখ মানুষের ওপর গবেষণার পর হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষকরা জানিয়েছেন, নিময় করে প্রতিদিন কফি

পান করলে মানুষের ভেতরের এ প্রবণতা অনেকাংশেই হ্রাস পায়। গবেষকদের মতে, কফির মধ্যে থাকা ক্যাফেইন নামক রাসায়নিক যৌগটি মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে সাময়িকভাবে হলেও চনমনে করে তোলে। যার মাধ্যমে মানুষের হতাশা দূর হয়ে যায়। মানুষ বেঁচে থাকার আনন্দ পায়, উচ্ছ্বাস পায়। ডিউক-এনইউএস গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্কুল সিঙ্গাপুর ও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করে গবেষকরা বলেছেন, প্রতিদিন ২ কাপ বা তার বেশি কফি পান লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়ে অবধারিত মৃত্যুর ঝুঁকি ৬৬ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করে। বেশ কয়েক বছর ধরে ৪৫ থেকে ৭৪ বছর বয়সীদের ওপর গবেষণা চালানোর পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন গবেষকরা। 'হেপাটোলজি' সাময়িকীতে গবেষণা প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে। নন-ভাইরাল হেপাটাইটিসের কারণে যে প্রাণঘাতী লিভার সিরোসিস দেখা দেয়, তা থেকে সুরক্ষা দেয় কফি।

কফির জন্য বিখ্যাত শহর: কফির জন্য বিখ্যাত পৃথিবীর আট শহর। লন্ডনে এসপ্রেসোকে ভিন্ন মাত্রায় এনে অসিস এবং কিউস শহরে প্রথম কফিসপ শুরু হয়। এখানে ফ্ল্যাট হোয়াইট এবং ক্যাপাচিনোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি। কফি যেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে মেলবোর্নবাসীর। মেলবোর্ন শহরে আপনার ভালো লাগবে না এমন কফি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্ক্যান্ডানেভিয়ানদের মাথাপিছু কফি গ্রহণের হার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীরা কফি বলতে পাগল। রেকযাভিকে কফি ছিল খাবারের চেয়েও বেশি প্রিয়। রোম-ইতালিয়ান সংস্কৃতির একটি অংশ কফি। হাতে গুণে কয়েকজনকে পাওয়া যাবে যারা কফি খান না। সিঙ্গাপুরের জীবনযাত্রায় সবসময়ই অংশ হয়ে আছে কফি। আমেরিকার ছোট অংশ সিয়াটলের ক্যাপিটল হিলে ভিকট্রোলা কফি রোস্টারস, কলাম্বিয়া সিটিতে ইস্পায়ার স্প্রেসো এবং সিটেল কফি ওয়ার্কসে খুঁজে পাওয়া যাবে পছন্দের স্প্রেসো এবং ক্যাপাচিনো। ভিয়েনার ঐতিহ্য হিসেবে ২০১১ সালে ইউনেস্কোর তালিকাভুক্ত হয় কফি। ওয়েলিংটনে বাড়িতে, অফিস-আদালতেও আপ্যায়ণ করার জনপ্রিয় উপকরণ কফি।

কফি কমাবে স্কিন ক্যান্সারের ঝুঁকি: ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমা এমন এক ধরনের স্কিন ক্যান্সার যার ফলে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে আর তার ঝুঁকি কমাতে পারে কফি পানের অভ্যাস। গবেষণায় দেখা যায় যারা কফি পান করেন না তাদের তুলনায় যারা দৈনিক চার কাপ বা তার বেশি কফি পান করে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোমার ঝুঁকি কমে যায় ২০ শতাংশ পর্যন্ত। গবেষণা থেকে দেখা যায়, চার কাপ বা তার বেশি কফি পান তেমন ক্ষতিকর নয়। তবে আপনার যদি এতো বেশি কফি পানের অভ্যাস না থাকে তবে হুট করে চার কাপ কফি পান শুরু করে দেবেন না, তাতে হিতে বিপরীতও হতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে আপনি বেশি করে কফি পান করলেই স্কিন ক্যান্সার থেকে রেহাই পাবেন। স্কিন ক্যান্সার হবার মূল কারণ কোনোরকম নিরাপত্তা ছাড়া সূর্যের আলোয় বেশি সময় কাটানো। তাই অতিরিক্ত সূর্যের আলো এবং অতিবেগুনি রশ্মি থেকে দূরে থাকাই উত্তম। যারা নিয়মিত কফি পান করতে অভ্যস্ত, তাদের জন্য সুখবর, কফি পানের অভ্যাস দেয় কয়েক ধরনের স্কিন ক্যান্সার থেকে নিরাপত্তা।

দিনে কত কাপ কফি: ফিমেলফার্স্ট ডটকো ডটইউকে'র এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা অনুসারে শরীরে খুব বেশি হলে দৈনিক ৪০০ মি.গ্রাম ক্যাফেইন নেওয়া যেতে পারে। তবে কফি ছাড়াও চা, চকলেট ও রঙিন কোমল পানীয়তেও আছে ক্যাফেইন। সারা দিনে কফি ছাড়া এসবও খাওয়া পড়ে। তাই সব মিলিয়ে দেখা যায়, শরীরে অতিরিক্ত ক্যাফেইন চলে যাচ্ছে। তাহলে দিনে কত কাপ কফি নিরাপদ? এমন প্রশ্নের জবাবে গবেষকেরা বলছেন, এক কাপ পরিমাণ চায়ে প্রায় ৩০ থেকে ১০০ গ্রাম ক্যাফেইন রয়েছে, যেখানে এক কাপ ইনস্ট্যান্ট কফিতে আছে ৬০ থেকে ১০০ গ্রাম এবং

এসপ্রেসো কফিতে ৪০ থেকে ৯০ গ্রাম। গবেষকেরা বলছেন, দিনে চার কাপের বেশি কফি পান না করা হলে এই সমস্যা হয় না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, দৈনিক দুই থেকে তিন কাপ কফি পান আসলে খারাপ নয়। তাছাড়া কফিতে আছে ফ্ল্যাভনয়েড, যা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে ও বিভিন্ন ক্যানসার, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ঝুঁকি কমায়। ক্যাফেইন ব্যথা কমাতে সহায়ক, ঠাণ্ডা লাগলে শ্বাসনালি প্রসারিত করতে সাহায্য করে এবং ঘুম তাড়ায়, মেজাজ ভালো রাখে। তাই কফিকে যতটা খারাপ ভাবা হয়, এটি তত খারাপ নয়।

উপকার ও অপকার: যুক্তরাজ্যের দি গ্লেন হাসপাতাল ব্রিসটলের কনসালটেন্ট সার্জন এবং ওজন কমানোর বিশেষজ্ঞ স্যালি নরটন, ক্যাফেইন গ্রহণের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে বলেছেন:

- ক্যাফেইন স্নায়ুতন্ত্র উজ্জীবক এবং ডাইউরেটিক বা মূত্র উৎপাদন বাড়ায় সে কারণে বেশি কফি পান করলে বারবার বাথরুমে যেতে হয় এবং এতে বয়স্ক বা অসুস্থ মানুষের পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। আবার কফি পান হৃদস্পন্দন বাড়ায়, হাত কাঁপতে পারে কারও কারও, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

- কিছু গবেষণায় দেখা গেছে ক্যাফেইন হৃদপিণ্ডের রক্ত সরবরাহকারী ধমনীতে রক্ত চলাচল ধীর করে দেয়। বুকধড়ফড়ানি, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বা উচ্চ রক্তচাপের জন্যেও শরীরের অতিরিক্ত ক্যাফেইন দায়ী।

- গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, যারা দিনে তিন কাপের বেশি কফি পান করেন তাদের শান্তির ঘুম খুব কমই হয়। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা কফি খান না তাদের থেকে কফি পানকারীদের ৭৯ মিনিট কম ঘুম হয়। তাই ঘুমের সমস্যা থাকলে কফিকে না বলুন।

- ক্যাফেইন শরীরের অ্যাড্রেনালিন নামক এক ধরনের হরমোনের মাত্রা বাড়ায়। যে কারণে শরীরের টানটান উত্তেজনা বা ঘাবড়িয়ে যাওয়ার অনুভুতির মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

- দৈনিক পাঁচ কাপের বেশি কফি খেলে গর্ভধারণের ক্ষমতা কমে যেতে পারে। যদি মা হতে চান, তবে অবশ্যই কফি খাওয়ার পরিমাণ কমাতে হবে। দৈনিক ২০০ মি.গ্রাম ক্যাফেইন শরীরে গেলে গর্ভের শিশুর ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি জন্মত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

- যেকোনো খেলার আগে কফি পান শরীরে আনে আলাদা শক্তি। কফি শরীরে উদ্যম ও উৎসাহ তৈরি করে।

- গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক চাপের সময় ২০০ মি.গ্রাম ক্যাফেইন শরীরে গেলে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে প্রমাণ মিলেছে আলঝেইমার (স্মৃতিভ্রংশ) রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী পদার্থ ক্যাফেইন।

- ক্যাফেইন যুক্ত বা বিহীন যেকোনো ধরনের কফি টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগের ও কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকিও কমায়।

- গবেষণায় দেখা গেছে, কোনো কোনো সময় লিভার বা যকৃতের মেদ কমাতে ক্যাফেইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

কফি পানে সতর্কতা: গবেষকরা জানিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় বডি ক্লকের মাধ্যমে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হচ্ছে সূর্যের আলো। আর এ বডি ক্লক কর্টিসল নামে একটি হরমোন নিঃসরণ করে আমাদের সতর্ক ও জাগ্রত করে। সাধারণ অবস্থায় সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে কর্টিসল হরমোন সবচেয়ে বেশি নিঃসরণ হয়। ফলে এ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই দেহে যথেষ্ট উন্নতমানের 'প্রাকৃতিক ক্যাফেইন' থাকে। ফলে এ সময় অতিরিক্ত ক্যাফেইনের দরকার হয় না। উপরন্তু যখন শরীরে যথেষ্ট 'ক্যাফেইন' থাকে তখন আরো ক্যাফেইন গ্রহণ এর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়।

শরীর চাঙ্গা করতে ও ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত রাখতে কফি পানের জন্য কিছুটা ভিন্ন সময়সূচির কথা জানিয়েছেন গবেষকরা। সাধারণ মানুষের কর্টিসল মাত্রা সর্বোচ্চ পরিমাণে থাকে সকাল ৮টা থেকে ৯টা, দুপুর ১২টা থেকে ১টা ও বিকাল ৫:৩০ থেকে ৬:৩০-এর মধ্যে। এ কারণে কফি বিরতি হওয়া উচিত সকাল ৯:৩০ থেকে ১১:৩০ ও ১:৩০ থেকে ৫:০০টার মধ্যে, জানিয়েছেন আইওয়াটা।

কফি পানে অনেকটাই সতর্ক থাকা ভালো। কারণ এতে রয়েছে ক্রিয়াশীল মাদক ক্যাফেইন। তাই অতিরিক্ত কফি পান আপনার সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাতে পারে। ক্যাফেইন আসক্তি থেকে সৃষ্টি হয় অস্থিরতা, নার্ভাসনেস, উত্তেজনা, রাগ, পরিপাকজনিত অবসাদ, পেশিতে টান পড়া, অকারণে কথা বলা, ঘুম না হওয়া, দ্রুত ও অনিয়মিত হার্টবিট ইত্যাদি। তাই কফি পান করার পর যদি এগুলোর মতো উপসর্গ টের পান, তবে এটা কফি ইনটক্সিকেশন হতে পারে। সাধারণত ক্যাফেইন মানুষকে উদ্যমী হতে সাহায্য করে, কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় ও ঘুমভাব কাটাতে সাহায্য করে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী কফি পান করতে হবে। দিনে দু'বারের বেশি কফি পান না করাই ভালো। এত বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থেকেও কিছু উপকারিতাও আছে।

(দি হেলথ সায়েন্স, বার্তা সংস্থা এএনআই ও 'হেপাটোলজি' সাময়িকী অবলম্বনে)

আড়ালের ভাষা

অসীম সরকার

কবিগুরু, সাধু ও চলতি ভাষায় আপনার
মন ভরেনি।
আপনি আরও একটি ভাষার প্রয়োজন
অনুভব করতেন– যার নাম দিয়েছিলেন
আড়াল-আবডালের ভাষা– প্রেমের ভাষা।
আপনার অনুভব যথার্থই।
শুনেছি– শক্তি, জয় গোস্বামী, সৈয়দ হক, পূর্ণেন্দু পত্রী
শামসুর রাহমানও নাকি তলে তলে
এমন একটি ভাষাই চাইতেন।
তারা বলার সাহস করেননি।
নির্মলেন্দু গুণও নাকি মিনমিন করে এ দাবির পক্ষে
কিছু বলতে চেয়েছিলেন।
উচিত কথা বলে দেশান্তরি হওয়া
তসলিমা নাসরিন
এ ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি সাহসই দেখিয়েছেন।
তবে কবি, আপনার চাওয়াটি কিন্তু বেশ
মজবুত– পাকাপোক্ত ছিলো।
আপনার মতো আর কোনো শালা এতো
সাহস দেখাতে পারেননি।
প্রথম যেদিন আমি আপনার তৃতীয় ভাষা–
মানে, আড়াল আবডালের– প্রেমের ভাষার
চাহিদার কথা জানলাম
সেদিন থেকেই আপনাকে পরম বন্ধু ভাবতে
শুরু করেছি।

আপনি বিশ্বাস করুন, তৃতীয় ভাষার চাহিদা
আমাকে অনেক বেশি তাড়িত করে।
তৃতীয় মত, তৃতীয় নয়ন, তৃতীয়পক্ষ– এসব শব্দের
আলাদা একটা সম্মান আছে।
তেমনি তৃতীয় ভাষারও।
আমি তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের একজন
কলোনিয়াল স্বভাবের নাগরিক
মন বলতে তেমন কিছু নেই।
কণ্ঠনালির নিচে আটকে থাকে সব ইচ্ছে-আহ্লাদ।
মনের মতো একটি ভাষার অভাবে
আমার প্রেমিক
হৃদয়ের সব কথারা ডানাহীন পাখির মতো
ছটফটিয়ে মরে।
সবকিছুতেই আমি হীনমন্যতায় ভুগি।
মুক্তবাজারও আদা কিংবা হলুদের মতো
আমার সব ইচ্ছের
পেটেন্ট নিয়ে যেতে চায়।
আমি যখন রাষ্ট্রবিহীন কাক শালিক বৃক্ষকে প্রেমিকার
সঙ্গে কথা বলতে দেখি
তখন আমার ইচ্ছে হয় কাক হতে।
ওদের হাতে রয়েছে মনের কথা বলার একটি
শক্তিশালী ভাষা।
কবিগুরু, আজ শুধু আপনাকে
ভর্ৎসনা করতে ইচ্ছে হচ্ছে– আপনি কেন প্রেমের বা
আড়াল আবডালের–
তৃতীয় ভাষার কাজটি করে গেলেন না
কেন আটকে থাকলেন চলতি হাওয়ায়!

রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণি ও মানবপ্রেম

মো. মাহবুব হোসেন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক সাহিত্যের প্রায় সকল শাখাতেই অনন্য ভূমিকা রেখেছেন– প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, সংগীত, চিত্রাংকন প্রভৃতি ক্ষেত্রেই দ্যুতি ছড়িয়েছেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫২টি। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দুই হাজার গান লিখেছিলেন। কবিতা ও গান ছাড়াও তিনি ১৩টি উপন্যাস, ৯৫টি ছোটগল্প, ৩৬টি প্রবন্ধ ও গদ্যগ্রন্থ এবং ৩৮টি নাটক রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সব লেখা রবীন্দ্র রচনাবলি নামে ৩২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর সামগ্রিক চিঠিপত্র উনিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি প্রথম এশীয় হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্য অপূর্ণ এমন কথা বলার দুঃসাধ্য কি কারও আছে? কিন্তু কবিগুরু নিজেই বলেছেন - 'তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা-/ আমার সুরের অপূর্ণতা।/ আমার কবিতা, জানি আমি, /গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।' [কাব্য: জন্মদিনে, কবিতা: ঐকতান]

অর্থাৎ কবি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁর সাহিত্যে সাধনা অসম্পূর্ণ। কিন্তু কবি কেন বললেন এমন কথা, আর কোন বিষয়টিই বা তাঁর সাহিত্যে অনুপস্থিত? এই ব্যাখ্যাটিও তিনিই দিয়েছেন উল্লেখিত 'ঐকতান' কবিতাতেই। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন- *'তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-/ বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার/ তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।/ অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে/ সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।'*

সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি, শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে তিনি ইঙ্গিত করলেন- স্বীয় সাহিত্যকর্মে তাদের যথাযথ সম্মান দিতে পারেননি। এটি মহানুভব কবির আত্মবিশ্লেষণ। তাইতো ব্যর্থতার আত্মদহনে অতঃপর কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় মানবপ্রেমের জয়গান। আগামী দিনের সাহিত্যে যেন উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অস্পৃশ্য শ্রেণির যথাযথ মূল্যায়ন হয়, আর সে কারণে তিনি অন্ত্যজ শ্রেণির ঘর থেকেই নতুন কবির আবির্ভাব কামনা করেছেন- 'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,/ কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,/ যে আছে মাটির কাছাকাছি,/ সে কবির-বাণী-লাগি কান পেতে আছি।/ সাহিত্যের আনন্দের ভোজে/ নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে জমিদার ছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সখ্যভাব গড়ে উঠবার তেমন সুযোগ ছিল না কবির। জমিদার শ্রেণির সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্পষ্ট ব্যবধানটা তিনি দেখিয়েছেন 'দুই বিঘা জমি' কবিতায়। এ যেন শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্ব। সে ক্ষেত্রে জমিদার রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের জয় হয়েছে। এ কবিতায় কবিগুরুর সহানুভূতি যেন ওই নির্যাতিত শোষিত শ্রেণি তথা খেটে খাওয়া অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি উপেনের প্রতি। তাইতো কবি লিখলেন - 'এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি/ রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।'

'সোনার তরী' কাব্যের নাম কবিতা 'সোনার তরী'তে তিনি শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি একজন মাঝি ও একজন কৃষকের ছবি অংকন করেন। রূপক অর্থে শিল্পসত্তার ধারক হিসেবে একজন কৃষককেই তিনি দাঁড় করিয়েছেন। তার সারা বছরের পরিশ্রমের ফসল ধানগুলোকে কৃষক সোনার তরীতে তুলে দিয়ে শূন্য হাতে রয়ে যায় নদী তীরে। 'কালের আবর্তে মানুষ বিলীন হয়ে যায় কিন্তু টিকে থাকে তার কর্ম' মানবজীবনের বাস্তবধর্মী এই দর্শনকে তিনি একজন কৃষকের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন-

'শূন্য নদীর তীরে/ রহিনু পড়ি',/ যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।'

কবির জীবন সায়াহ্নে আত্মবিশ্লেষণধর্মী অনেক কবিতা পাওয়া যায়। জীবনের পড়ন্ত বেলায় তিনি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব মেলানোর চেষ্টা করেছেন তার লেখায়। এ ধরনের রচনায়ও কবির মানব প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়-

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,/ আমি তোমাদেরই লোক/ আর কিছু নয়-/ এই হোক শেষ পরিচয়।'

[কবিতা: পরিচয়, কাব্য: সেঁজুতি]

এভাবেই 'পুনশ্চ', 'বীথিকা', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' বিভিন্ন কবিতায় অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জনমানবের প্রতি কবির বিশেষ সহানুভূতিবোধ প্রকাশ পেয়েছে। 'কল্পনা' কাব্যের 'হতভাগ্যের গান', 'পসারিনী', 'উন্নতিলক্ষণ' প্রভৃতি কবিতায় অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য ও সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। সেইসঙ্গে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের 'ভারততীর্থ',

'দীনের সঙ্গী', 'অপমানিত', 'ধূলামন্দির' প্রভৃতি কবিতাতেও তাঁর মানবপ্রীতি লক্ষ করা যায়- 'মানুষের অধিকারে/ বঞ্চিত করেছ যারে/ সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান /অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' [অপমানিত- গীতাঞ্জলি]

কাব্য সাহিত্যের ন্যায় গদ্য সাহিত্যেও বিশেষ করে অনেক ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতি তথা অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি ভালোবাসা পরিস্ফুট হয়। জমিদার রবীন্দ্রনাথ সমাজের উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে যেতে পারেননি এটি যেমন সত্য, তেমনি লেখক রবীন্দ্রনাথ সক্ষম হয়েছেন সাধারণ মানুষের জীবনবাস্তবতাকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে। অন্ত্যজ মানুষের জীবনভাবনা চমৎকারভাবে উঠে এসছে কবির বিভিন্ন ছোটগল্পে। লেখকের 'শাস্তি' গল্পে ফুটে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি দুইজন দিনমজুর দুখিরাম ও ছিদামের জীবন বাস্তবতার চিত্র। অভাব, দারিদ্র্য ও জীবনসংগ্রাম তাদের নিত্য সঙ্গী। তবে গল্পে তার চেয়েও অধিক প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক সম্পর্কের জটিল রূপ। রাগের মাথায় বড় ভাই দুখিরাম স্ত্রীকে আঘাত করলে স্ত্রী মারা যায়। 'বউ গেলে বউ পাইবো, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আরতো ভাই পাইবো না।' এই ভাবনায় ছোট ভাই ছিদাম হত্যাকাণ্ডের দায় চাপায় তার স্ত্রী বাড়ির ছোট বউয়ের ওপর। অবশ্য পরবর্তীতে ছিদাম তার স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য বারবার চেষ্টা করে, কিন্তু অভিমানী স্ত্রীও স্বামীর ওপর চরম প্রতিশোধ নেয় খুনের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে।

'কাবুলিওয়ালা' গল্পে জীবিকার তাগিদে দেশত্যাগী আফগান নাগরিক রহমতের জীবনসংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে। ভিনদেশী কন্যা মিনিকে দেখে তার মধ্যে যে পিতৃস্নেহ জাগ্রত হয়েছে তা যেন চিরন্তন পিতৃস্নেহের বাস্তব রূপায়ণ। আর লেখক রবীন্দ্রনাথের কাছে এর মানবিক মূল্য অপরিসীম–

'তখন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম– তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা।' [কাবুলিওয়ালা]

লেখক রবীন্দ্রনাথ শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের রূপটি গদ্য আকারে তুলে ধরেছেন 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে। অন্ত্যজ মানুষ শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই তাদের ওপর খড়্গ নেমে আসে। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোয় বিনা অপরাধে জেল খাটে আদর্শ যুবক শশীভূষণ। সমাজের উপেক্ষিত শ্রেণির আরও এক নির্মম রূপের পরিচয় পাওয়া যায় 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে। জমিদার গোমস্তার হাতে প্যারী দাসীর লাঞ্ছনা নিম্নবর্গের মানুষের নিরাপত্তাহীনতাকে সুস্পষ্ট করে। নায়েব গিরিশ বসুর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয় সে।

শুধু কবিতা বা ছোটগল্পে নয় উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব, অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি বঞ্চনাকে চমৎকারভাবে রূপায়ণ করেছেন। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রকণ্ঠে উদ্ভাসিত হয়েছে মানবপ্রেম। লেখকের 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসে এর পরিচয় পাওয়া যায়। 'গোরা' উপন্যাসে পতিত মানুষজনের প্রতি প্রবল মমত্ববোধ, বর্ণবৈষম্যহীন বিদ্রোহী মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ জমিদার হয়েও সাধারণ প্রজাদের জন্য তার হৃদয় কেঁদে ওঠে- 'আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে, ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে, ভারতবর্ষই মরছে'।

এছাড়া 'রক্তকরবী' নাটকে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের আত্মসচেতনতা, আত্মজাগরণ, শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া, প্রতিবাদী ভূমিকা, সর্বোপরি আত্মত্যাগের মাধ্যমে নিয়মের পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, বিদেশি শোষণের নগ্ন রূপ। ফুটে উঠেছে ইংরেজ শাসনের অন্তরালে ভারতবাসীদের মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের দৈন্যদশার দায় যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর, সে বিষয়টি লেখক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন–

'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তধারায় রয়েছে বংশমর্যাদা ও কৌলিন্য, তবে তাঁর মননে ও সত্তায় রয়েছে মানবপ্রেম। কবির জীবনদর্শনে রয়েছে গভীর মানবপ্রীতি। এ জনপদের উপেক্ষিত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে তিনি দেখেছিলেন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। তিনি বাংলাদেশের পদ্মা, বড়াল কিংবা গড়াইয়ের স্রোতধারায় শিলাইদহ, শাহজাদপুরসহ বিভিন্ন জনপদে বিচরণ করেছেন, তখন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন খেটে খাওয়া কৃষক, শ্রমিক, জেলেসহ উপেক্ষিত জনমানবের জীবনযাত্রা। নিরহংকার, অত্যন্ত সরল এ মানুষগুলোর দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের যতটুকু প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন, তাতেই কবিহৃদয়ে করুণ সুর বেজে ওঠে। সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে বিশ্বকবির বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটকে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, শহীদ নূরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজ, কাশীনাথপুর, সাঁথিয়া, পাবনা।

নতুন ফসল ব্রোকলি আবাদে কৃষক জয়নাল আবেদীন

মো. ফায়সাল হোসেন ও প্রতাপ চন্দ্র রায়

কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার পিহর গ্রামের বাসিন্দা জয়নাল আবেদীন। জয়নাল আবেদীন একজন পূর্ণাঙ্গ কৃষক। তিনি মূলত একজন সবজি চাষি। কৃষি ছাড়া তার অন্য কোন আয়ের উৎস নাই। কৃষিই তার বেঁচে থাকার মূল উৎস। প্রচলিত উন্নত জাতের সবজি চাষের সঙ্গে সঙ্গে নতুন জাতের কোন ফসলের সংবাদ পেলে তা চাষ করে দেখার আগ্রহ তার রয়েছে। তাই তিনি নিয়মিত এগুলোর খোঁজ রাখেন। সে হিসেবেই তিনি ব্রোকলি চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

জয়নাল আবেদীন পৈতৃকভাবে মোট সম্পত্তি পেয়েছেন ১০০ শতাংশ এবং এই ১০০ শতাংশ জমির মধ্যে ৮ শতাংশ তিনি বসতভিটা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে জয়নাল আবেদীন কৃষি কাজ করছেন সর্বমোট ১৭২ শতাংশ জমিতে। এর মধ্যে নিজের ৯২ শতাংশ, লিজ নিয়েছেন ৩০ শতাংশ এবং বন্ধক নিয়েছেন ৫০ শতাংশ- সর্বমোট ১৭২ শতাংশ। এই জমিতে তিনি নানা ধরনের ফসলাদি চাষাবাদ করেন যেমন ব্রোকলি, বেগুন, ধনিয়া, করলা, শশা, মরিচ ইত্যাদি। জয়নাল আবেদীন বিগত ২ বছর যাবত ব্রোকলি চাষ করছেন এবং ব্রোকলি চাষ করে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। যার ধারাবাহিকতায় তিনি নভেম্বর '২৩ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্রোকলি সবজি চাষ করেছেন।

ব্রোকলির উৎপত্তি ইতালিতে এবং ইতালিয়ান ভাষায় Brocco শব্দ থেকে ব্রোকলি নামের উৎপত্তি হয়েছে। ধীরে ধীরে তা ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতালি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। ব্রোকলিতে ক্যান্সার প্রতিরোধক উপাদান আছে। ক্রুসিফেরী পরিবারের ফসলগুলোর মধ্যে ব্রোকলি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ব্রোকলির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে Brassica oleracea var.italica। ব্রোকলি ঠান্ডা আবওহাওয়ার ফসল বলে শুধুমাত্র রবি মৌসুমেই চাষ করা হয়। ১৫ ডিগ্রি-২০ ডিগ্রি মাসিক গড় তাপমাত্রা ব্রোকলি চাষের জন্য ভালো। বাংলাদেশের শীতকালীন আবওহাওয়া ব্রোকলি চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

ব্রোকলি দেখতে অনেকটা ফুলকপির মতো, তবে সবুজ রঙের হয়। চারা রোপনের ৬০ দিনের মাথায় পুষ্পমঞ্জুরী বের হয় এবং এর ১৫ দিনের মাথায় খাদ্য উপযোগী হয়। বারী ব্রোকলি-১ এর ওজন হয় ৫০০-৭৫০ গ্রাম। ব্রোকলি একটি লাভজনক ফসল। ব্রোকলির বাজারমূল্য অন্যান্য ফসলের চেয়ে বেশি ও পুষ্টিমানও অনেক বেশি। ব্রোকলিতে ভিটামিন, আয়রন, ক্যালসিয়াম রয়েছে প্রচুর পরিমাণে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

জয়নাল আবেদীনের ৮ জনের পরিবার। জয়নাল আবেদীনের পিতা মো. লাল মিয়া হাজী, বয়স ১০৫ বছর। তার মা মমতাজ বেগম, বয়স ৭৫ বছর। জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী রাশেদা বেগমের বয়স ৫৫ এবং পেশায় গৃহিণী, পুত্র মো. মিজানুর রহমান বয়স ৩৩ বছর, পেশায় কৃষক। মিজানুর তার পিতা জয়নাল আবেদীনকে কৃষিকাজে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে থাকে এবং পুত্রবধু তাছলিমা বেগম একজন গৃহিণী, বয়স ২৮ বছর। নাতনী মাহি আক্তার বয়স ৮ বছর তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াশোনা করে এবং নাতী সাইদ হোসেন প্রথম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে। জয়নাল আবেদীনের বয়স ৬৫ বছর।

বর্তমানে ১৫ শতক জমিতে তিনি ব্রোকলি চাষ করেছেন। মূলত ইউটিউব দেখে তিনি ব্রোকলি চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি নিমসার মোহম্মদ আলী নার্সারী থেকে ব্রোকলির চারা সংগ্রহ করেছেন। ব্রোকলি হলো এমন একটি ফসল যা আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তি এবং সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে চাষাবাদ করতে পারলে অত্যন্ত লাভজনক। ব্রোকলিতে ফুলকপির চেয়ে লাভ বেশি হয়, কারণ ফুলকপি একবার কাটলে আর ফল হয় না।

আর ব্রোকলির ফল একবার তোলার পর এর গোঁড়া থেকে আবার নতুন করে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার ফল বের হয়, সেজন্যই এটাকে রেটুন ক্রপ বলে। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসলটিও বিক্রি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ জয়নাল আবেদীন বলেন ১৫ শতক জমিতে ব্রোকলি চাষ করে তিনি ৪০ হাজার টাকার বেশি লাভ করেছেন, এই পরিমাণ জমিতে ফুলকপি

চাষ করলে তিনি ৩০ হাজার টাকার বেশি লাভ করতে পারতেন না। সে জন্যই তিনি বলেছেন যে, ব্রোকলি চাষ ফুলকপির চেয়ে অধিক লাভজনক।

জমি প্রস্তুতি: নভেম্বর'২৩ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি জমি প্রস্তুতি শুরু করেন। জমি প্রস্তুতির সময় জয়নাল আবেদীন ট্রাক্টরের মাধ্যমে সর্বমোট তিনটি চাষ দেন। এতে তার সর্বমোট ১২০০ টাকা ব্যয় হয়েছে। চাষ পরবর্তীতে তিনি নিজেই সার প্রয়োগ করেছেন এবং যে সমস্ত সার ব্যবহার করেছেন তা নিম্নরুপ-

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য টাকায় (কেজি প্রতি)	মোট মূল্য (টাকা)
কম্পোস্ট	১০০ কেজি	১২	১২০০
ইউরিয়া	০৫ কেজি	৩০	১৫০
টিএসপি	১৫ কেজি	৩০	৪৫০
পটাশ	০৫ কেজি	২৬	১৩০

চারা সংগ্রহ: নিমসার বাজার থেকে তিনি দুই হাজারটি ট্রপিক-না ব্রোকলি চারা সংগ্রহ করেছেন। ১টি চারার মূল্য ৫ টাকা করে যার সর্বমোট মূল্য ১০,০০০ টাকা। চারা নিয়ে আসার জন্য পরিবহণ খরচ হয়েছে ৫০০ টাকা। চারা নিয়ে আসার সময় তার প্রায় ৮০ টি চারা নষ্ট হয়ে যায় এবং চারা রোপণ পরবর্তীতে পঁচা রোগের জন্য তার প্রায় ১৭০টি চারা পঁচে যায়। তিনি জমি প্রস্তুতির পরপরই এ চারা সংগ্রহ করে তার জমিতে রোপণ করেন। চারা রোপণের জন্য ৩ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে যার দৈনিক পারিশ্রমিক ছিল জন প্রতি ৬০০ টাকা করে। ৩ জন শ্রমিকের মোট শ্রম মূল্য ১৮০০ টাকা।

আন্তঃফসল পরিচর্যা: ব্রোকলি রোপণের জন্য তিনি জমির ভেতরে বেড বা কেইল তৈরি করেন। চারা লাইন করে রোপণ করানো, সেচ দেওয়া, নিড়ানী, কীটনাশক দেওয়ার জন্য কেইল ব্যবহার করেন। কেইল বা বেড তৈরি করতে ২ জন শ্রমিক লেগেছে যাদের দৈনিক শ্রমমূল্য ছিল ৬০০ টাকা করে। ২ জনের মোট ১২০০ টাকা এবং সময় লেগেছে ১ দিন।

সার ব্যবহার: তিনি জৈব সারের মধ্যে শুধু গোবর সার ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও বিভন্ন ধরনের অজৈব সার ব্যবহার করেছেন। যেমন-

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি)	মূল্য টাকায় (প্রতি কেজি)	মোট মূল্য (টাকা)
ইউরিয়া	১৫	৩০	৪৫০
টিএসপি	৬০	৩০	১৮০০
পটাশ	১০	২৬	২৬০
জিংক(হেক্টা)	১	২৫০	২৫০
সালফার	০.৫০	১২০	১২০
বোরণ	০.৫০	১৮০	১৮০

উপরোক্ত সারসমূহ তিনি চারা রোপণের ২৫ দিন পর একটি হালকা চাষ দিয়ে প্রয়োগ করেছেন। সার প্রয়োগ করতে সময় লেগেছে ১ দিন। সার প্রয়োগের জন্য শ্রমিক নিয়েছেন ১ জন, যার দৈনিক শ্রম মূল্য ৬০০ টাকা।

কীটনাশক ও আগাছা দমন: তিনি যে সমস্ত কীটনাশক ব্যবহার করেছেন তা হলো ইন্ডোফিল এম-৪৫, রিডোমিল গোল্ড, গোল্ডাজিম, ফ্লোরা, সোলার, এমাকার প্রভৃতি। এর মূল্য ও পরিমাণ নিম্নে প্রদান করা হলো-

কীটনাশকের নাম	পরিমাণ (ফাইল)	মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
রিডোমিল গোল্ড	৪	২০০	৮০০
গোল্ডাজিম	৬	১৩০	৭৮০
সোলার	৫	১৫০	৭৫০
এমাকার	৬	১০০	৬০০

উপরে উল্লেখিত সমস্ত কীটনাশকই স্প্রে মেশিনের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বেই তার ১টি আধুনিক স্প্রে মেশিন ছিল যা তিনি ব্যবহার করেছেন। চারা লাগানোর ২ দিন পর পঁচা রোগের জন্য অর্থাৎ ব্রোকলির পাতার রিং দাগের জন্য রিডোমিল গোল্ড ও গোল্ডাজিম কীটনাশক প্রয়োগ করেন এবং এ কীটনাশক প্রয়োগের জন্য তিনি ১ জন শ্রমিক ১ দিনের জন্য নিয়েছেন যার শ্রমমূল্য ছিল ৬০০ টাকা। চারার ৪-৫ পাতা হওয়ার পর ফ্লি বিটল ও ক্যাটারপিলার পোকার জন্য

সোলার ও এমাকার কীটনাশক স্প্রে করেন। উক্ত কীটনাশক প্রয়োগের জন্য তিনি ১ জন শ্রমিক ১ দিনের জন্য নিয়েছেন যার শ্রমমূল্য ছিল ৬০০ টাকা। উক্ত কীটনাশক ১ সপ্তাহ পরপর স্প্রে করেছেন। কীটনাশক প্রয়োগ করতে ২ বারে তার ২ জন শ্রমিক প্রয়োজন হয়েছে যার শ্রমমূল্য ১২০০ টাকা। এছাড়া কীটনাশক সংগ্রহ করতে তার কোন অসুবিধা হয়নি। আগাছা দমনের কাজ তিনি উল্লেখিত শ্রমিকের মাধ্যমেই সম্পন্ন করেছেন।

সেচ: জয়নাল আবেদীন মোট ৩টি সেচ প্রদান করেছিলো, প্রথম সেচ তিনি চারা রোপণের সময় দিয়েছেন, দ্বিতীয় সেচ ২৫ দিন পর দিয়েছেন এবং তৃতীয় সেচ ৫০ দিন পর দিয়েছেন। তার এ সেচ কার্যক্রম নিজস্ব স্যালো মেশিনের মাধ্যমে করেছেন। স্যালো মেশিনের জন্য তেল খরচ বাবদ তিনি ৯০০ টাকা খরচ করেছেন।

ফসল তোলা: চারা রোপণের ৭০ দিন পর অর্থাৎ জানুয়ারি'২৪ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি ফসল তোলা শুরু করেন। ১ থেকে ২ দিন গ্যাপ দিয়ে তিনি ফসল তুলে বাজারে বিক্রি করতেন। জয়নাল আবেদীন প্রতিবারে ১০০ থেকে ১৫০টি করে ব্রোকলি বাজারে নিয়ে যেতেন। তিনি আনুমানিক ১৭৫০টি ব্রোকলি বাজারে বিক্রি করেছেন। ফসল তোলার জন্য তিনি ২ জন শ্রমিক ৬০০ টাকা করে দৈনিক শ্রমমূল্যে নিয়োগ দিয়েছেন এবং ফসল তোলার জন্য শ্রমিক বাবদ তার মোট ১২০০ টাকা খরচ হয়েছে। বলে রাখা ভালো যে ফুলকপি বা পাতাকপি একবার কাটলে শেষ হয়ে যায় তবে ব্রোকলি এক্ষেত্রে আলাদা। ব্রোকলি একবার কাটলে আবারও গোড়া থেকে কুশি বেরিয়ে ফুল হয় পরে সেই ফুলও বিক্রি করা যায়। জয়নাল আবেদীন উক্ত রেটুন ক্রপের আনুমানিক ৫০০ পিস বাজারে বিক্রি করেছেন। চারা থেকে ব্রোকলি কাটার ১০ দিন পর পুনরায় কুশি বের হয়ে পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে তা পরিণত হয়।

ফসল বিক্রি: জয়নাল আবেদীন তার উৎপাদিত ফসল নিকটবর্তী নিমসার বাজারে বিক্রি করেন। এটি একটি বেশ বড় বাজার। প্রচুর পরিমাণ সবজি এ বাজার থেকে ট্রাকে করে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে যায়। ব্রোকলি বাজারজাতের বিষয়টি অন্যান্য সবজি বাজারজাতের চাইতে একটু ভিন্ন। কেননা ব্রোকলি একসাথে বেশি করে কেটে মাঠ থেকে সরাসরি বিক্রয় করা যায় না, কারণ সে ধরনের ক্রেতা পাওয়া যায় না। তাই ব্রোকলি অল্প পরিমাণ কেটে বাজারে নিয়ে খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে হয়। জয়নাল আবেদীন প্রথম দফায় আনুমানিক ৩৫০ পিস ব্রোকলি নিমসার বাজারে নিয়ে যান। এগুলি বাজারে নিয়ে যাবার জন্য তিনি ক্রেট ব্যবহার করেন। তিনি প্রতি পিস ৫৫ টাকা দরে বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করেছেন, পরবর্তী ৯০০ পিস ৩৮ টাকা দরে বিক্রি করেছেন এবং পরবর্তী ৩৫০ পিস গড়ে ২৭ টাকা দামে বিক্রি করেছেন। তিনি তার রেটুন ক্রপ ১২ টাকা দামে আনুমানিক ৫০০ পিস বিক্রি করেছেন। তিনি তার ফসল অটোরিকশাতে করে নিমসার বাজারে দুবার নিয়েছেন এবং এতে তার খরচ হয়েছে ৫০০ টাকা করে মোট ১০০০ টাকা। এছাড়া অধিকাংশ সময় ফসল বাজারে নিয়ে যাবার জন্য জয়নাল আবেদীন তার নিজস্ব সাইকেল ব্যবহার করেছেন। প্রতিবারেই তিনি নিমসার বাজারের বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রয় করেছেন।

উৎপাদন: মোট উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ছিল ১৭৫০ পিস এবং রেটুন ক্রপ ৫০০ পিস। যার মোট বাজার মূল্য ৬৮,৯০০ টাকা। জয়নাল আবেদীনের কোন ফসল নষ্ট হয়নি। তিনি আনুমানিক প্রায় ২০ পিস ব্রোকলি নিজের জন্য এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে দিয়েছেন আরো ১৫ পিস ব্রোকলি। তিনি অন্যান্য সবজির মতই ব্রোকলি রান্না করে খেয়েছেন এবং তার কাছে তা সুস্বাদু লেগেছে। এছাড়াও তিনি ব্রোকলিতে যে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। ব্রোকলি বিক্রি করতে তার কোন অসুবিধা হয়নি তবে একত্রে অনেকগুলো বিক্রি করতে পারলে তার পরিবহণ খরচ কমত বলে মন্তব্য করেন।

আয়-ব্যয়ের হিসাব: ব্রোকলি উৎপাদনের জন্য তিনি মোট ব্যয় করেছেন ২৬,৬২০ টাকা এবং মোট বিক্রি করেছেন ৬৮,৯০০ টাকা। এতে তার নীট লাভ হয়েছে ৪২,২৮০ টাকা। তার নিজস্ব শ্রমের আনুমানিক মূল্য ১২,০০০ টাকা। নিজস্ব শ্রমের মূল্য ব্যয়ের খাতে ধরলেও এটি বাদ দিয়ে তার নীট লাভ থকে ৩০,২৮০ টাকা। মোট আয় ৩০,২৮০ টাকা।

তিনি জানান তিনি আরও বেশি ব্রোকলি চাষ করবেন এবং ব্রোকলি চাষ অনেক লাভজনক হওয়ায় সকলকে চাষের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। জয়নাল আবেদীন আগামী বছর ৩০ শতক জমিতে ব্রোকলি চাষ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তিনি ব্রোকলি চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন, তার এ উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

লেখক-
মো. ফায়সাল হোসেন, ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), নিমসার ব্রাঞ্চ
প্রতাপ চন্দ্র রায়, জুনি. অফিসার (এগ্রি), প্রধান কার্যালয়, সিদীপ

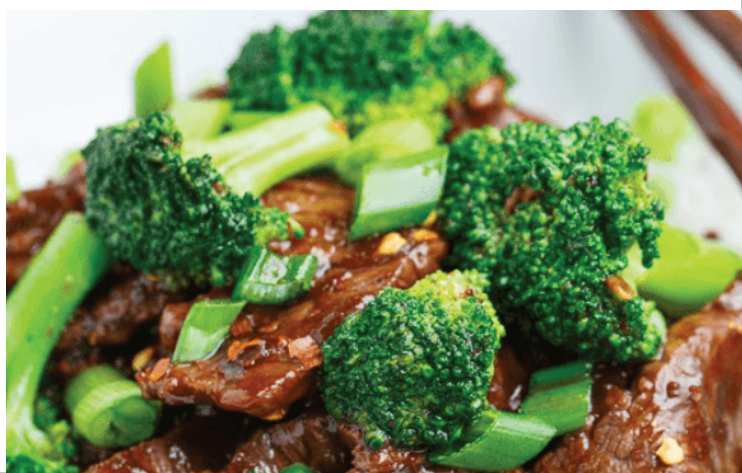

আমাদের দেশে ব্রোকলি চাষ শুরুর কথা

ফজলুল বারি

ব্রোকলির ওপর লেখাটির জন্য লেখকদ্বয়কে ধন্যবাদ। শিক্ষালোকে এটি ছাপাতে গিয়ে বাংলাদেশে ব্রোকলি চাষের আদি কথা আমার মনে পড়ল। আমার জানা মতে কুমিল্লা একাডেমীতে (বার্ড) সর্বপ্রথম এই পুষ্টিসমৃদ্ধ সবজিটি একাডেমীর অভয় আশ্রমস্থিত প্রদর্শনী খামারে আজ থেকে প্রায় ৫৬ বছর আগে চাষ করা হয়। তখন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হরটিকালচার বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আর এল ক্যারোলাস বেশ কিছু নতুন সবজি প্রচলনের উদ্যোগ নেন, যার মধ্যে ব্রোকলি একটি। ব্রোকলি গাছটি দেখতে ফুলকপির মতই। তবে এর পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। এতে ক্যারোটিনের পরিমাণ ফুলকপির চাইতে ১০০০ গুণ বেশি, প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৩০% বেশি এবং এতে যথেষ্ট মিনারেলও রয়েছে।

তখনকার সময়ে অভয় আশ্রমটি ছিল কুমিল্লা সমবায়ের গ্রাম সমিতির প্রতিনিধি ম্যানেজার ও মডেল ফারমারদের প্রশিক্ষণস্থল আর ঐখানকার কৃষি ফার্মটি ছিল উন্নত ও নতুন ফসল চাষের প্রদর্শনী মাঠ। ম্যানেজার, মডেল ফারমারগণ এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এগুলির আবাদ করতেন। ব্রোকলি তাদেরকে আকৃষ্ট করলেও এর আবাদ এবং প্রচলন তখন জনপ্রিয়তা পায়নি। সে সময় ১৯৭৩-৭৪ সালে কুমিল্লা সদরে ব্রোকলি চাষ এবং এর ব্যবহারের উপর আমি একটি জরিপ করে কতিপয় কৃষকের সাক্ষাৎকার নিয়ে How Sweet is Broccoli নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। নতুন এই ফসল নিয়ে তখনকার অভিজ্ঞতা আজকের পাঠকদের সাথে বিনিময় করার জন্য এই ভূমিকার অবতারণা। ১৯৭৩-৭৪ সালে ১২টি গ্রাম সমবায় সমিতির ৫০ জন কৃষক প্রায় ৫,০০০ ব্রোকলির চারা তাদের জমিতে রোপণ করেন। International Voluntary Services থেকে আগত রুমানা প্যাডলান নামে একজন ফিলিপাইনের মহিলা ভলানটিয়ার এটি সার্বিকভাবে দেখাশুনা করতেন। এই ৫০ জন কৃষকের মধ্যে ৪টি গ্রাম থেকে ৫ জন কৃষকের ব্রোকলি চাষ এবং এর ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য নেই। অজানা একটি নতুন ফসলের প্রথম চাষের অভিজ্ঞতা খুবই মজার এবং তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আলাদা যা এই পরিসরে বলা কঠিন। তবে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১। বারপাড়া গ্রামের ছিদ্দিকুর রহমান। তিনি ৬০০ চারা কেনেন ১২ টাকা দিয়ে। ১৫০টি চারা বিক্রি করে দেন পার্শ্ববর্তী এক কৃষকের কাছে। বাকি ৪৫০টি চারা রোপণ করেন বাঁধাকপির ক্ষেতে 'গ্যাপ ফিলিং' হিসাবে অর্থাৎ বাঁধাকপির যে সকল চারা মরে গেছে সে সকল জায়গায় রোপণ করেন। যখন ফুল আসতে শুরু করে তখন তিনি অভয় আশ্রম অফিসে যোগাযোগ করেন বিক্রির জন্য। খুব একটা সাড়া পাননি। এর মধ্যে ৫০টি গাছে তেমন ফুল আসে না। ৫০টি গাছ গরু খেয়ে ফেলে। ৫০টি ব্রোকলি নিজেরা খেয়েছেন ও আত্মীয়স্বজনকে বিতরণ করেছেন। বাকি ৩০০টি ব্রোকলি ১৫০ টাকায় বিক্রি করেছেন। তিনি বলেন, ব্রোকলি খেতে মোটামুটি সুস্বাদু, তবে এর চাষবাস ফুলকপির তুলনায় কম লাভজনক। তারপরও তিনি আগামী বছর চাষ করবেন বলে জানান।

২। কুচাইতলির ওয়াহিদ মিয়া। কুচাইতলি গ্রামটি অভয় আশ্রম সংলগ্ন। ওয়াহিদ মিয়া একজন বর্গা চাষি। নিজের কোন জমি নাই। এ বছর ৬০ শতক জমি বর্গা নিয়েছেন। তিনি অভয় আশ্রমে গিয়েছিলেন বাঁধাকপির বীজ কিনতে। এক আউন্স বীজ কিনেছিলেন ৬.৫০ টাকায়। বীজ থেকে চারা করে তা ৪ শতক জমিতে রোপণ করেছিলেন। ফুল আসলে দেখেন এতো বাঁধাকপি নয়, অন্য কিছু। পরে জানতে পারেন, এর নাম ব্রোকলি। কিন্তু ওয়াহিদ মিয়া ঘুরাঘুরি করেও এটি বিক্রি করার কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। এর মধ্যে তিনি প্রায় ৩৫-৪০ টাকার সার ব্যবহার করেছেন। আমি যখন তার

ব্রোকলি ক্ষেতে উপস্থিত হই তখন তার সব ব্রোকলি গাছ ক্ষেতেই শুকিয়ে গেছে।

৩। ভাড়েরা ইউনিয়নের রামপুরা গ্রামের বাসিন্দা আবদুল মালেক। ঐ গ্রামেই অবস্থিত একটি ডাকঘরের তিনি পোস্টমাস্টার। তিনি ১৯৬৮ সালে এই গ্রামে রামপুরা কৃষক সমবায় সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন এবং প্রথমে সমিতির মডেল ফারমার ও পরে ১৯৭১ সালে এর ম্যানেজার হন। তিনি প্রায় ২.৪০ একর জমির মালিক। ভাড়েরা ইউনিয়নটি ময়নামতি অঞ্চলে অবস্থিত এবং সবজি চাষে বিখ্যাত। তিনি অভয় আশ্রম থেকে ব্রোকলি সম্পর্কে জানেন এবং ২৫ টাকা দিয়ে ১০০০ চারা কিনেন। তিনি কুমিল্লাস্থ ব্যাপটিস্ট মিশনের একজন পাদ্রি সাহেবের কাছ থেকেও কিছু বীজ পান। মালেক ব্রোকলির কিছু চারা তার গ্রামের আশেপাশেও বিতরণ করেন।

তিনি ১৬ শতক জমিতে ব্রোকলি চাষ করেন এবং ফুলকপির চাষের মতই জমি চাষ, গোবর, রাসয়নিক সার যথা ইউরিয়া, টিএসপি, পটাশ ইত্যাদি ব্যবহার করেন। তার মোট খরচ হয় ৬০ টাকা। তিনি তার উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকই নিজে, আত্মীয়স্বজন এবং পাড়াপড়শিদের মাঝে বিতরণ করেন। বাকি অর্ধেক ফসল ৯০ টাকায় বিক্রি করেন। যেহেতু এটি নতুন ফসল, লোকে চেনে না, তাই ফুলকপির তুলনায় এর বাজারদর অনেক কম। আর খাওয়ার বেলায়ও বাংলা খাবারের মত ঝোল দিয়ে রান্না করে খেয়েছেন। মালেক জানান, ব্রোকলি খুব একটা লাভজনক ফসল নয়, কেননা পাশের সমপরিমাণ জমিতে আলু চাষ করে ৪০০ টাকা লাভ হয়েছে। তারপরেও তিনি ব্রোকলি চাষ করবেন এ জন্য যে, এটি খুব পুষ্টিকর একটি ফসল এবং এটি সম্পর্কে মানুষের আরও জানা উচিৎ। তবে এটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশে একটি অর্থকরি ফসল হিসাবে বিবেচিত হবে বলে তিনি মনে করেন।

৪। রামপুরা গ্রামের সিরাজ মিয়া। সিরাজ মিয়ার বয়স প্রায় ৬৫ বছর। তিনি আবদুল মালেকের কাছ থেকে ৮০০ চারা নিয়ে ব্রোকলি চাষ করেন। কিন্তু চারা রোপণে দেরি হয়ে যাওয়ায় তার ফসল ভাল হয়নি। তাছাড়া তার ছেলেরা জমিতে অতিরিক্ত সার দিয়ে ফসল নষ্ট করে ফেলেছে। তার বিনিয়োগকৃত ২০ টাকাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫। আনন্দপুর গ্রামের আলী আকবর। অভয় আশ্রমের ট্রেনিং ক্লাশ থেকে ব্রোকলির কথা জানতে পেরে আলী আকবর ৮০০ চারা সংগ্রহ করে তার জমিতে রোপণ করেন কিন্তু তিনিও দেরি করে ফেলেন। জানুয়ারি মাসে রোপণ করে ভাল ফলন পাননি। শেষে গরুকে খাইয়ে দিয়েছেন। তিবে তিনি বলেন, যেহেতু এটি নতুন ফসল তাই তিনি সময়মত চারা পেলে আগামী বছরও চাষ করে দেখতে চান।

এবার নিজের কথা একটু বলে শেষ করি। আমি যখন একাডেমীতে চাকুরি করতাম তখন কুমিল্লা শহরে আমার বাসার সামনে একটি পুকুরপাড়ে আমি ব্রোকলি চাষ করতাম। কারণ এই সবজিটি আমি খুব পছন্দ করি। পুকুরপাড় বলে জমিটি খুব উর্বর ছিল। সার ছাড়াই ফসল ভাল হতো। গাছগুলিতে যখন ফুল আসতে শুরু করত তখন আমি গাছগুলির পরিচর্যা করতে গেলে পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষজন আমাকে বলত, সাহেব, কেন বৃথা পরিশ্রম করছেন। গাছগুলি অতিরিক্ত বেড়ে গেছে, এতে কোন ফল আসবে না। ব্রোকলির ফুল আর পাতা একই রঙের বলে তারা দেখতে পেত না যে সবগুলি গাছেই ফুল এসেছে এবং জমির উর্বরতার কারণে ফলনও খুব ভালো হত। আশে পাশের অনেকেই খেয়ে, ব্রোকলি নামের সবজিটিকে চিনতে পেরেছিলেন।

এটি গোড়ার কথা। ব্রোকলির আবাদ বাংলাদেশে বেড়েছে। মৌসুমের সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বাজারেই এটি বিক্রি হতে দেখা যায়। পত্র-পত্রিকায়ও ব্রোকলির চাষ ও ফলন সম্পর্কে অনেক খবর প্রকাশিত হয়। তবে ব্রোকলি ব্যাপক হারে আমাদের দেশে চাষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বলে মনে হয়। তার প্রধান কারণ ব্রোকলি বাজারজাতকরণ সমস্যা। ব্রোকলি এমন একটি ফসল যা জমি থেকে কাটার পর দীর্ঘ সময় রেখে দিলে এর স্বাদ ও গুণাগুণ কমে যায়। এর চাহিদাও থাকে না। তবে এটিকে ফ্রিজভুক্ত করতে পারলে, যা বিদেশে করা হয়, এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এটি এখনও গড়ে উঠেনি। সেজন্য আড়তদারগণ এটি পাইকারি দরে কেনেন না। খুচরা বিক্রেতাদের কাছেই বিক্রি করতে হয়। তাই ফুলকপির চাইতে ব্রোকলির পুষ্টিমান বেশি এবং এর চাষবাসে অধিক মুনাফা সত্ত্বেও এর আবাদ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, যদি না ফ্রিজভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের আলোচ্য নিবন্ধটি থেকেও তা বুঝা যায়।

ব্রোকলি খাওয়ার ব্যাপারেও একটি সমস্যা আছে। এটি হচ্ছে এর রন্ধন প্রক্রিয়া। গ্রামের মানুষেরা যেভাবে ফুলকপি রান্না করে সেভাবেই ব্রোকলিও রান্না করে। যদিও তাঁরা বলছেন, ব্রোকলি খেতে সুস্বাদু কিন্তু ঠিক ফুলকপির মত এটিকে ব্যবহার করতে পারছেন না। কিন্তু শহরের মানুষজন এটি ব্যবহার করছেন ভিন্নরূপে। ব্রোকলির নানা ধরনের 'রেসিপি' প্রকাশিত হয় পত্রপত্রিকায়। সেজন্য ব্রোকলি শহরের মানুষের কাছে অধিকতর জনপ্রিয়। বিক্রিও হয় শহরের বাজারেই বেশি। ব্রোকলি যেহেতু একটি পুষ্টিকর ফসল এবং এর আবাদে কৃষক অধিক লাভবান হন, সেহেতু এটিকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে চাইলে এবং কৃষকদের লাভবান করতে চাইলে এ সকল সমস্যাদির সমাধান নিয়ে কাজ করতে হবে।

লেখক: সম্পাদক, শিক্ষালোক

অনুকরণীয় নারী উদ্যোক্তা হয়ে উঠছেন

সিদীপ শিক্ষিকা সমিতির শামস-উন নাহার

মনজুর শামস

সিদীপের মুন্সীগঞ্জ শাখার শিক্ষাসুপারভাইজার শামস-উন নাহার মুন্সীগঞ্জ শিক্ষিকা সমিতির সভানেত্রী। এ শাখায় শিক্ষিকা সমিতি গঠিত হওয়ার পর থেকেই তিনি এই সমিতিতে সঞ্চয় করে আসছেন। ২০১৫ সাল থেকে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির একজন শিক্ষিকা হিসেবে তিনি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে আসছিলেন। এরপর ২০১৮ সালের ১ জুন মুন্সীগঞ্জ শাখার শিক্ষা সুপারভাইজারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পাশাপাশি তখন থেকেই ছোট পরিসরে বুটিকস-এর ব্যবসা শুরু করেন। সৃষ্টিশীল উদ্যম আর অক্লান্ত পরিশ্রমে এ ব্যবসায় অল্পদিনেই তিনি সফলতার মুখ দেখেন। একসময় তার বুটিকস ও মিনি গার্মেন্টসে ২৫ জন কর্মীর কর্মসংস্থানে সক্ষম হন। খুব দ্রুতই বেড়ে উঠতে থাকে তার ব্যবসা। এলাকায় সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়ে তার সব আয়োজন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা মহামারির কারণে লাগাতার লকডাউন দেয়া হলে বুটিকসের ব্যবসাটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

কিন্তু তিনি দমে যাওয়ার পাত্রী নন। নিজের উদ্যোগের ধরনটা বদলে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইলেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু করলেন দেশি মুরগির খামার ও হ্যাচারি। উদ্যোক্তা হিসেবে তার এই নব উদ্যোগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় সিদীপ এবং তার ঠিকাদার ব্যবসায়ী স্বামী শাহ আলম। সিদীপ থেকে সুফলন ঋণ নেন এবং স্বামীর কিছু টাকায় একটি ডিম থেকে সরাসরি বাচ্চা ফোটানোর ইনকিউবেটর মেশিন কেনেন। বর্তমানে তার ফার্মে ২৫০টি ফাউমি মুরগি আছে যার মধ্যে প্রায় ২০০টি মুরগি ডিম দেয়। তিনি এখন নিজের মুরগির ডিম থেকে নিজের মেশিনের মাধ্যমেই বাচ্চা ফোটান এবং বিক্রি করেন। আবারো বড় হয়ে উঠছে তার ব্যবসা এবং বেশ ভালো লাভের মুখ দেখছেন। এর পাশাপাশি দেড় বিঘা জমিতে পুকুর খনন করে তেলাপিয়া মাছের সাথে অন্য দেশীয় মাছও চাষ করছেন।

তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে অনার্স প্রথম বর্ষ আর মেয়ে দশম শ্রেণিতে পড়ছে। ছেলে এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করায় সিদীপ থেকে মেধা বৃত্তি পেয়েছিল। বর্তমানে তার খামারে তার বড় ভাইসহ মোট তিনজন লোক কাজ করে।

এছাড়াও সিদীপ থেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর শজনে গাছের বিশদ উপকার সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তিনি তার পুকুরের চারপাশে শজনে গাছ লাগিয়েছেন। এখানেও তিনি আশার অলো দেখতে পাচ্ছেন।

সাফল্যের উদাহরণ

রেহেনা বেগম

কিশোর কুমার

মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার লতব্দী ইউনিয়নের মাহামুদপুর গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারের গৃহবধূ রেহেনা বেগম। স্বামী মো. আসাদ আলী। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত তাদের। যদিও ৩ বিঘা জমি আছে, কিন্তু টাকার অভাবে জমিতে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হত না। তাই স্বামী প্রায় সারা বছর অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করেন এবং অল্প কিছুদিন নিজের জমিতে কাজ করেন। তবে কাজ না থাকা এবং শারীরিক অসুস্থার জন্য প্রতিদিন কাজ করতে পারেন না। এছাড়া আছে ১টা গাভী ও তার বাছুর। বাছুর জন্মানোর পর সেই গাভী থেকে প্রতিদিন ১-১.৫ লিটার দুধ পওয়া যায় এবং দুধ বিক্রয় করে প্রতিদিন প্রায় ৮০ টাকা আয় হয়। এভাবেই চলে রেহেনা বেগম ও মো. আসাদ আলীর সংসার।

রেহেনা বেগমের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। স্বামী-স্ত্রী ও ১ মেয়ে ১ ছেলে। ছেলেকে টাকার অভাবে লেখা পড়া করাতে পারেননি এবং মেয়েকে স্কুলে লেখাপড়া করাচ্ছেন। দারিদ্র্যের কারণে দিনরাত স্বামী-স্ত্রী ২ জনে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করার পরও সংসারের অভাব দূর হয় না।

প্রতিবেশীর কাছ থেকে রেহেনা বেগম জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র পরিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও এক ধরনের ঋণ দেয় যার কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং তার মধ্যে এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। বিষয়টি রেহেনা বেগম তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন এবং ঋণের টাকা দিয়ে তাদের নিজস্ব জমিতে এবং আরও লিজ নিয়ে সেই জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করে লাভের টাকা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেও লাভবান হওয়া সম্ভব বলে রেহেনা বেগম তার স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তাভাবনা বাস্তবসম্মত বলে স্বামী মো. আসাদ আলী স্ত্রীর কথায় সম্মত হন এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

তারপর রেহেনা বেগম সিদীপের সদস্যদের মাধ্যমে সিদীপের সদস্যপদ লাভ করেন এবং এক মাস পর সবজি চাষ প্রকল্পে ৪০,০০০ টাকা ঋণ প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব অনুযায়ী তার ঋণ মঞ্জুর হয় এবং ঋণের টাকা দিয়ে তিনি জমিতে শিম, লাউ, ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো এবং বেগুন চাষ করেন। ৬ মাসে রেহেনা বেগম তার সবজি ক্ষেত থেকে সব সবজি মিলিয়ে প্রায় ৬০,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করেন এতে সব খরচ বাদ দিয়ে তার লাভ হয় প্রায় ২০,০০০ টাকা। এই লাভের টাকা দিয়ে তারা আরও ১ বিঘা জমি বন্ধক নেন এবং রেহেনা বেগমের স্বামী অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি বন্ধ করে দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আরও ৭০,০০০ টাকা ঋণ নেন। সেই টাকা দিয়ে সবজি চাষ করেন ও ২টি ষাঁড় বাছুর ক্রয় করেন।

এসএমএপি ঋণ নেয়ার সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে ট্রেনিং করানো হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে তিনি পরিচিত হন এবং একই জমিতে কিভাবে চক্রাকারে ফসল ফলানো যায় সে বিষয় রেহেনা বেগম জ্ঞান লাভ করেন।

জমি বন্ধক নেওয়ার পর তিনি সিদীপ থেকে এসএমএপি ঋণ ৫০,০০০ ও অন্যান্য খাতের ঋণ ৫০,০০০ টাকা একসাথে করে ঋণের টাকা ও সবজি বিক্রয়ের লাভের টাকা দিয়ে মোট ৫ বিঘা জমিতে সবজি চাষ করেন। তার এই সবজি খেত থেকে এখন প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৫,০০০ টাকার সবজি বিক্রয় করতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে তার সবজি খেতে খরচ হয় প্রায় ১,০০০ টাকা এবং লাভ হয় প্রায় ৪,০০০ টাকা। তিনি আশা করছেন সবজি বিক্রয়ের টাকা দিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করার পরও মূলধন হিসাবে বন্ধক নেওয়া জমি এবং কিছু নগদ টাকা থেকে যাবে।

রেহেনা বেগম আরও জানান যে, তার সবজি খেতের কোন সমস্যা হলে ইউনিয়ন ও সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেন। সিদীপের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা পশু ও কৃষি কল সেন্টার নাম্বারের ব্যবহার, বিভিন্ন পকু ও কৃষি সমস্যা সমাধান সম্বলিত মোবাইল এ্যাপস-এর ব্যবহার ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রেহেনা বেগম তার আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙে ইটের বাড়ি তৈরি করেন এবং স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে এখন সুখেই সংসার করছেন। বর্তমানে তার দারিদ্র্য ঘুচে গেছে। ছোট মেয়েকে লেখাপড়ার জন্য স্কুলে ভালোভাবে পাঠানো শুরু করেছেন।

রেহেনা বেগম জানান যে, পরিশ্রম করলে সাফল্য আসবেই। তবে তার জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দরকার। সাফল্য অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কোন কিছু নেই, রেহেনা বেগম তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), সিদীপের কলাতিয়া ব্রাঞ্চ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

২ জুন ২০২৪ চাঁপাইনবাবগঞ্জ এরিয়ার ভোলাহাট শাখার আওতায় নেকজান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন হল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হোসনে আরা পাখি, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষার্থী, প্রধান কার্যালয়ের রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স কর্মকর্তা গাজী জাহিদ আহসান, ভোলাহাট শাখার শিক্ষা সুপারভাইজার সোনিয়া ও ব্রাঞ্চ একাউন্টেন্ট মো. সুজন আলী।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকার

পুরস্কার বিতরণ

৩০ মে ২০২৪ সোনারগাঁ শাখার আওতায় বৈদ্যেরবাজার নেকবর আলী মুন্সি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. কামাল হোসেন শিক্ষার্থীদের বই পড়তে উৎসাহিত করে বক্তব্য রাখেন। এ সময় সিদীপ সোনারগাঁ শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মো. মামুনুর রশিদ, শিক্ষা সুপারভাইজার তাহামিনা আক্তার এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

৬ জুন ২০২৪এ সিদীপের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে সফুরা খাতূন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সেরা পাঠক-পাঠিকাদের জন্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সম্মানিত প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম। বক্তব্য প্রদান করেন স্কুল কমিটির সদস্য জনাব মফিজুর রহমান ও বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শাহীনা ম্যাডাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মো. আরিফ হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন ব্রাঞ্চের ঝঅঈগঙ মো. অলিউল্লাহ, সংস্থার শিক্ষা সুপারভাইজার আফসানা আক্তারসহ অনেকে। সংস্থার প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান

সিরাজুদ দাহার খানের সমাজমনস্ক কবিতা নিয়ে আলোচনা

‘এবং বই’ ও ‘শিক্ষালোকে’র যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় সিদীপ কার্যালয়ের গ্রন্থাগার কক্ষে ৪ মে ২০২৪ সন্ধ্যায় সিরাজুদ দাহার খানের কবিতার বই ‘পার্থক্য করতে পারি না’ নিয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাবন্ধিক ফাতিহুল কাদির সম্রাটের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতিমান সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান ও উন্নয়ন বিষয়ক লেখক শাহজাহান ভুঁইয়া। সিরাজুদ দাহার খানের কবিতা নিয়ে আলোচনা সূত্রপাত করেন শিশির মল্লিক, মাহ্‌ফুজ সালাম ও বাসন্তি সাহা। পরে বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন অনার্য নাঈম, আবু রাকিব, শামসুল হুদা ও ঈপ্সিতা বহ্নি উপমাসহ অনেকে। ‘পার্থক্য করতে পারি না’ থেকে কবিতা পাঠ করেন নাজনীন সাথী, মুসতাগিসুর রহমান বাবু, আদিব সাদমান ও মিঠুন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ‘এবং বই’য়ের সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ ও ‘শিক্ষালোকে’র নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান।

সৈয়দ বদরুল আহসান সাহিত্যক্ষেত্রে বই নিয়ে আলোচনার গুরুত্ব এবং এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ভাল বইয়ের কথা পাঠকসমাজকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। আলোচকগণ কবি সিরাজুদ দাহার খানের আত্মসমালোচনার অকপট সাহস, সমাজসচেতনতা, সহজ উপস্থাপন ও পরিবর্তনকামী বক্তব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

সবশেষে সিরাজুদ দাহার খান তার কাব্যচর্চা সম্পর্কে বলেন এবং সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

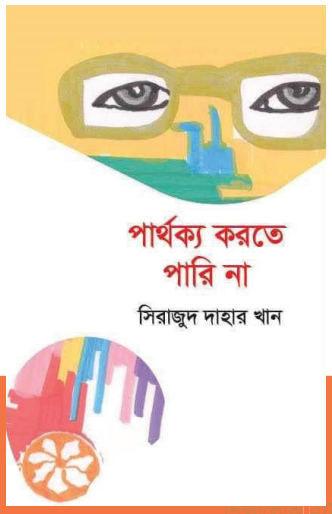

কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা

পার্থক্য করতে পারি না

সরদার আরিফ উদ্দিন

৪ মে তারিখে সিরাজুদ দাহার খানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "পার্থক্য করতে পারি না" নিয়ে একটি প্রকাশনা ও আলোচনা অনুষ্ঠান হয় ঢাকায় বেসরকারি সংস্থা সিদীপের প্রধান কার্যালয়ে। আয়োজক ছিলো 'এবং বই' ও 'শিক্ষালোক'। অনেক কবিতা বোদ্ধা ও সাহিত্য বোদ্ধাগণ উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন নির্ধারিত আলোচক কাব্যগ্রন্থটির উপর আলোচনা করেছেন। বেশ অনেকটা সময় ধরে প্রায় ২-৩ ঘণ্টা ব্যাপী অনুষ্ঠান বেশ উপভোগ্য ছিল। যদিও অনুষ্ঠানে আমি কোন আলোচক ছিলাম না, অনুষ্ঠানে থাকার কারণে পুরো আলোচনা শোনার পরে কিছু অনুভূতি তৈরি হয়েছে, সেটাই ব্যক্ত করছি।

১. কবিতা কী? কবিতা কি তার নির্ধারিত ব্যাকরণ মেনে চলবে, নাকি কবি এবং কবিতার নিজস্ব স্বাধীনতা থাকবে? কবি কতোটা স্বাধীনতা ভোগ করবে? আধুনিকতা কিংবা কবির স্বাধীনতার নামে কি কবিতায় শুধু কিছু শব্দের ভাগাড় তৈরি হবে? এগুলো খুব পুরনো বিতর্ক, নানাজনের নানা মত। এর কোন নির্দিষ্ট সমাধান নেই, একেক জনের একেক রকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক।

শুরুতেই একজন আলোচক দীর্ঘক্ষণ ধরে পুরো কাব্যগ্রন্থখানি ব্যবচ্ছেদ করেছেন। ভালোমন্দ মিশিয়ে তার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। সেই সাথে কবিতার ব্যকরণ কোথায় কোথায় মানা হয়নি, সেদিকেও উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এখানে আমার নিজের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কবিতার ব্যাকরণ (ছন্দ, তাল, লয়, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ইত্যাদি) জানাটা জরুরি। কিন্তু সব সময় মেনে চলতেই হবে, অক্ষরে অক্ষরে ব্যাকরণ মেনে কবিতা লিখতে হবে– এতটা জবরদস্তি করলে কবিতা তার স্বাভাবিক গতি হারায়, কবিতা হয়ে ওঠে কৃত্রিম এবং একজন কবি হয়ে ওঠেন ফরমায়েশি। কবিতা হতে হবে কাব্যিক ভাবধারায় প্রবাহমান, সোজাসুজি কিছু শব্দের মাধ্যমে বক্তব্য প্রদান করাই কবিতা হয়ে ওঠে না। তার মানে এই না যে, কবিতায় কোন বক্তব্য থাকবে না। আবার এটাও না যে, সমাজ সংস্কার করার দায়বদ্ধতা কবিতার কাঁধে থাকবে সব সময়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক:

একজন কবি লিখলেন, "হাত ফসকে পড়ে গেল চাঁদ।" / একজন অর্থনীতিবিদ, / এই কথাটাই বলবেন– অপারচুনিটি কস্ট / একজন উন্নয়ন কর্মী বলবেন– মিসড অপারচুনিটি / আবার আমাদের শোনা প্রবাদ– সময়ে এক ফোঁড়, / অসময়ে দশ ফোঁড়।

সবগুলো বক্তব্যের মূল অর্থ একই। কবিতার অর্থ যদি হয়, শুধুই বক্তব্য প্রদান, তাহলে সোজাসুজি অপারচুনিটি কস্ট কিংবা মিসড অপারচুনিটি বললেই তো হয়, হাত ফসকে পড়ে গেল চাঁদ বলার দরকার কী?

২. অন্য আলোচক শুরু করলেন, আমি কবিতা বুঝি না, কবিতা লিখি না, শুধু কবিতা পড়ি; বলেই, বেশ দীর্ঘ আলোচনা করলেন কাব্যগ্রন্থের উপর, একাধিক কবিতা নিয়ে বেশ জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও করলেন। নিঃসন্দেহে আলোচনা বেশ উপভোগ করেছি, নানামুখী ভাবনাও তৈরি হয়েছে।

কবিতা কিংবা কাব্যগ্রন্থের আলোচনা অনুষ্ঠানে নির্ধারিত আলোচক হয়ে, 'আমি কবিতা বুঝি না' বলার অর্থ কী? অতিরিক্ত বিনয়, নাকি ইচ্ছে করেই তার আলোচনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার কৌশল মাত্র। আমার ভিন্ন মত হলো, কবিতা বুঝতে হবে কেন? কবিতা তো বোঝার বিষয় না, কবিতা অনুভব করার বিষয়। আমরা ছোটবেলায় যেমন কিছু একটা ইংরেজি পড়তে গেলে ডিকশনারি নিয়ে বসতাম, কবিতার পাঠক কি তাহলে কবিতা পড়ার সময় বাংলা একাডেমির ডিকশনারি নিয়ে বসবে? কবিতায় ব্যবহৃত উপমা, রূপক কি ডিকশনারিতে পাওয়া যায়?

কবিতা পাঠককে কবির মতো করেই কেন কবিতার অর্থ বুঝতে হবে? আমাদের ছোটবেলায় বাংলা পরীক্ষায় কোন একটা কবিতার দু'লাইন তুলে দিয়ে বলা হতো– এখানে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? আমরা সে রকম প্রশ্নের উত্তরে বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য প্রাইভেট টিচার থেকে, কবি কী বলতে চেয়েছেন সেটা নোট করে আনতাম। এখন কি তাহলে, কবিতা পাঠককে সেরকম আয়োজন করতে হবে?

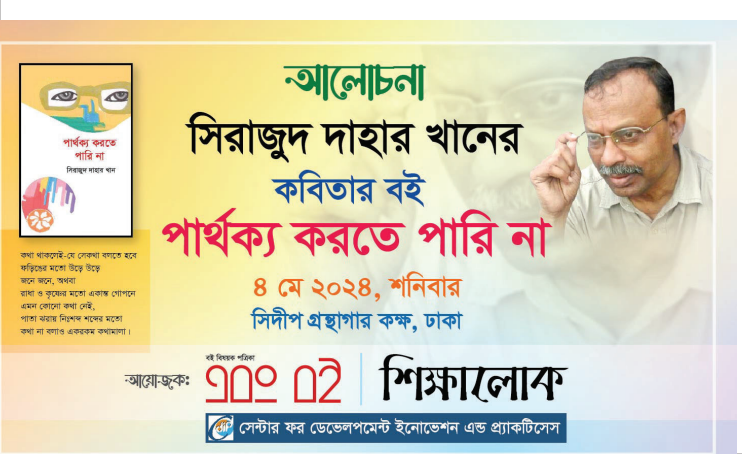

একজন কবি তার নিজের ভাবনা/অনুভূতি প্রকাশের জন্য একটি কবিতা লিখলেন, পাঠক হয়তো কবির মতো করেই বুঝলেন আবার নাও বুঝতে পারেন, পাঠক ভিন্ন কিছু ভাবতে পারেন, একই কবিতা নিয়ে অন্য একজন পাঠক হয়তো আরো ভিন্ন কিছু ভাবতে পারেন। এভাবেই একটি কবিতা অনেক ভাবনার সূত্রপাত করতে পারে। একটি কবিতা এভাবে সমাজে অনেক ভাবনা সৃষ্টি করে একটা ভাবনা-জাল তৈরি করতে পারে, এখানেই কবি এবং কবিতার সার্থকতা। কবিতা কিভাবে সমাজে ভাবনা-জাল তৈরি করে এবং বহু ভাবনার মধ্যে সমন্বয় তৈরি করে সেটাই দেখার বিষয়। একক কোন কবিতা এই ভাবনা-জাল তৈরি করতে নাও পারে, অনেক অনেক কবিতাও সম্মিলিতভাবে সেই ভাবনা তৈরি করতে পারে। আমার ধারণা, এটাই কবিতার মূল ভিত্তি।

৩. কাব্যগ্রন্থের শিরোনাম 'পার্থক্য করতে পারি না,' একটি কবিতার শিরোনাম দিয়েই পুরো কাব্যগ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। এমনটা হরহামেশাই হয়। হতেই পারে। একজন আলোচকের 'শিরোনাম' পছন্দ হয়নি, কয়েকটি নাম প্রস্তাব করেছেন তিনি, সেটা করতেই পারেন, ভিন্ন জনের ভিন্ন মত থাকতেই পারে।

আমার তো শিরোনামটা খুবই পছন্দ হয়েছে। শিরোনামের মধ্য দিয়েই পাঠককে কাব্যগ্রন্থের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য ওয়েলকাম করা হয়েছে। তবে বইটি হাতে নিয়ে আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি হয়েছে: কবি কী পার্থক্য করতে পারেন না? উনি কি পার্থক্য করতে পারেন না, নাকি পার্থক্য করতে চান না? পার্থক্য করতে পারি না অর্থ এক ধরনের এস্কেপ করা, নিজের সীমাবদ্ধতার কারণে 'পারি না'। কিন্তু যদি 'পার্থক্য করতে চাই না' বলা হয়, তাহলে নিজের একটা শক্ত অবস্থান জানান দেয়া হয়।

এই যে কতগুলো প্রশ্নের জন্ম হলো পাঠকের মনে, পাঠককে কাব্যগ্রন্থের ভেতরে প্রবেশ করতে আগ্রহী করে তোলা হলো, পাঠক যদি বইটি নাও কেনেন, তারপরও তার মনে কিছু ভাবনার জন্ম হলো। কবিতা যদি পাঠককে ভাবিয়ে তুলতে না পারে, তবে আর লাভ কি কবিতা লিখে?

যখন 'পার্থক্য করতে পারি না' কবিতাটি পড়লাম, যেখানে বলা হয়েছে–
"নারী পুরুষের মধ্যকার পার্থক্য করতে পারি না
ধর্মে ধর্মে পার্থক্য করতে পারি না
জাতিতে জাতিতে পার্থক্য করতে পারি না" ইত্যাদি।
এবার বুঝলাম, কেন 'পার্থক্য করতে চাই না' না বলে 'পার্থক্য করতে পারি না' বলা হলো। নারী পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্য করতে চাই না, বললে সেই প্রথম উদাহরণের মতো হতো, সরাসরি ভাষা– কবিতার কাব্যিকতা হারাতো।

কবিতায় একটি অসাধারণ ফর্ম ব্যবহার হয়েছে, আমরা চাচ্ছি একটি পজেটিভ মাইন্ডসেট কিন্তু ব্যবহার করছি নেগেটিভ শব্দ এবং কাব্যিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। এখানেই কবি'র মুন্সিয়ানা। পাঠককে সাথে নিয়ে চলার দৃঢ়তা। দাহার ভাইয়ের জন্য শুভ কামনা রইলো।

মে ৫, ২০২৪

লেখক: কবি ও উন্নয়নকর্মী

লেখক ও অনুবাদশিল্পী
মনজুর শামসের ৬৩তম জন্মদিবস উদযাপন

মনজুর শামসকে কেক খাওয়াচ্ছেন সিদীপের নির্বাহী পরিচালক

২৯ এপ্রিল ২০২৪ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে আমাদের সবার প্রিয়জন 'একশত গ্রামীণ উদ্যোক্তা' ও 'একুশটি ব্যবসা: আপনার জন্য' ইত্যাদি বহুল সমাদৃত বইসমূহের লেখক এবং দেশের একজন খ্যাতিমান অনুবাদশিল্পী মনজুর শামসের ৬৩তম জন্মদিবস উদযাপন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদাসহ অডিট ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্মকর্তা এবং গবেষণা ও প্রকাশনা টিমের ও ডিজিটাইজেশন বিভাগের সকল কর্মী।

মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা: দাবাড়ু

নাজনীন সাথী

লেখক– স্টেফান সোয়াইগ
অনুবাদ– আনিস হক
প্রকাশক– সমাবেশ

বিশ শতকের দু'দুটো মহাযুদ্ধের পরে একুশ শতকের পৃথিবী প্রত্যক্ষ করলো অন্যরকম বিশ্বযুদ্ধ! করোনার প্রবল প্রতাপে থমকে গেল সভ্যতার চাকা। ব্যস্ত নগর পরিণত হলো রূপকথার অচলায়তনে। অতিক্ষুদ্র জীবাণুর দোর্দণ্ড প্রতাপের কাছে অসহায় হয়ে পড়লো মানুষ। অবশেষে বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত হলো কোভিডের প্রতিরোধক টিকা। ততদিনে পৃথিবী থেকে ঝরে গেছে লক্ষ লক্ষ মানবপ্রাণ।

দুঃসময়ের দীর্ঘতর রাতগুলো পেরিয়ে দুহাজার চব্বিশ সালের বইমেলায় উপস্থিত হতে পারাটা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের ব্যাপার। এবারের বইমেলা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও দুনিয়াজুড়ে ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব সত্ত্বেও বই প্রকাশে ঘাটতি নেই!

একুশে ফেব্রুয়ারিতে বরাবরের মতো শহীদ মিনার পেরিয়ে মেলায় গিয়ে উপস্থিত হই। এ-বই সে-বই দেখে কিনে ফেলি বেশকিছু বই; এরমধ্যে একটির নাম 'দাবাড়ু'। কোন এক টিভি চ্যানেলের বই পরিচিতি অনুষ্ঠানে আলোচনা শুনে আগ্রহ জন্মে বইটির প্রতি। বইমেলা থেকে ঘরে ফিরে বহু বছর বাদে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলি সম্পূর্ণ বইটা। প্রশ্ন জাগতেই পারে কি এমন বই লিখেছেন অস্ট্রিয়ান লেখক স্টেফান সোয়াইগ? আর কেনইবা অনুবাদ করেছেন জার্মান প্রবাসী লেখক আনিস হক। অনুবাদক বরফঘেরা আল্পস পর্বতের পাদদেশে মিউনিখে থাকেন– শুভ্র বরফের মাঝে একটুকরো লালসবুজকে ধারণ করে। তাই বাংলা ও বাঙালির প্রতি এই দায়বদ্ধতা।

লেখকের দু' পাতার চিঠি বাদ দিলে বইটি সবশুদ্ধ ষাট পাতার। প্রত্যেক পাতায় রয়েছে উত্তেজনা আর উত্তেজনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে মানবিকতা আর নির্মমতার জ্বলন্ত উদাহরণ। যেমনটি বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাৎসি ও গেস্টাপোর অত্যাচার ও বর্বরতা যে শুধু হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, অত্যাচার ও শারীরিক নির্যাতনই ছিল না, সেইসঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে মানুষের আত্মিক বিনাশেও প্রচেষ্টারত ছিল, তারই কুশলী প্রকাশ তাঁর Schachnovelle বইটিতে। একজন দাবা খেলোয়াড়, যার সামগ্রিক বোধ ও উপলব্ধি দাবা আর উপার্জিত অর্থেই সীমাবদ্ধ। আরেকজন– যিনি জীবনের সামগ্রিক সচেতনতায় ঐশ্বর্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বন্দীদশায় দাবাকে নিঃশ্বাসের একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একেবারেই ভিন্ন মানসের এই দুই দাবাড়ুর অপ্রত্যাশিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বুয়েন্স আয়ার্সগামী এক জাহাজে, কয়েকজন উৎসাহী অপেশাদার দাবাড়ুর সামনে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধচলাকালীন দাবাকে উপজীব্য করে দুজন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সংকটকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন লেখক স্টেফান সোয়াইগ।

জার্মান স্বেচ্ছাচারিতা চরমে উঠলে প্রতিবাদ ও হতাশায় লেখক অস্ট্রিয়া ছেড়ে পাড়ি জমান লন্ডনে। লেখালেখির সুবাদে তিনি পরিচিত হয়ে উঠেন যুদ্ধবিরোধী মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে। ১৯৩৬ সালে যুদ্ধ দানা বেঁধে উঠবার পূর্বেই জার্মানীতে তার যাবতীয় রচনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও তিনি এই ভেবে শঙ্কিত ছিলেন যে, জার্মান ভাষাভাষী হিসেবে তিনি অন্তরিন হতে পারেন। এজন্য লন্ডন ছেড়ে আমেরিকা আর্জেন্টিনা প্যারাগুয়ে হয়ে ব্রাজিলে যান। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত থেকে যান ব্রাজিলেই।

কখনও কখনও অল্পকথায় খুব সহজেই অনেক গভীরে পৌঁছানো যায় আবার কখনও দীর্ঘ আলোচনাতেও তা হয়ে উঠে না; দাবাড়ু বইটা ঠিক তেমনি একটি রচনা। স্বল্পকথায় চমৎকারভাবে স্ফুটিত হয়েছে লেখকের যুদ্ধবিরোধী মানবিক সত্তা। বইটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আরেকবার ভিন্নভাবে অনুভূত হবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কতটা ভয়াবহ কতটা বিভীষিকাময় ছিল। জানতে পারা যাবে লড়াই শুধু যুদ্ধের মাঠেই হয় না; মানুষের মনেও হয় কখনও কখনও। মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের ভয়াবহতা মানুষকে কতটা বিপর্যস্ত করতে পারে তা জানতে পড়তে হবে 'দাবাড়ু' বইটা। বইটা পড়তে গিয়ে আরেকবার অনুভব করা যাবে মানুষের চেতনাকে নাড়া দিতে কতটা শক্তিশালী হতে পারে একটা বই।

শজনে ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২৮ ও ৩০ মে ২০২৪ সিদীপ প্রধান কার্যালয়ে ২টি ব্যাচে ৩৫ জন শিক্ষা সুপারভাইজারদের নিয়ে শজনে ও তালগাছ চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তাল ও শজনের চাষ পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কৃষিবিদ ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা এবং তাল ও শজনের পুষ্টিগুণ নিয়ে আলোচনা করেন পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম। প্রশিক্ষণে সিদীপ গভর্নিং বডির ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়া উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের তাল ও শজনে চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন ও এ কর্মসূচিতে সফলভাবে অংশগ্রহণে তাদেরকে উৎসাহিত করেন গবেষণা ও প্রকাশনা ডিপার্টমেন্টের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের মোহাম্মদ ইয়াহিয়া অডিটোরিয়ামে শিক্ষালোক জীবনানন্দ সংখ্যার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) প্রকাশনা অনুষ্ঠানে জীবনানন্দ নিয়ে আলোচনা করছেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক আমীন আল রশীদ। তার ডানে 'এবং বই'এর সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ ও তার ডানে (সামনে) সিদীপের নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা।

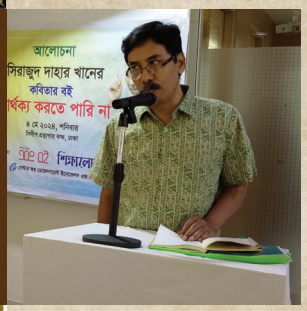

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

Shikkhalok
(a CDIP education bulletin)
11th year 2nd issue, April-June 2024